ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস

(১ম খণ্ড)

রানার প্রকাশন

ধলেশ্বর রোড নং—৮, আগরতলা

প্রথম প্রকাশ— জানুয়ারী, ১৯৮৪

প্রকাশিকা :

বকুল দাস

রানার প্রকাশন

ধলেশ্বর রোড—৮,

আগরতলা।

প্রচ্ছদ :

প্রাং

মুদ্রাকর :

নবেন্দু ভট্টাচার্য

ছাপাকুঠি

অভয়নগর,

আগরতলা—৫

মূল্য—ছয় টাকা

রনজিৎ পালের

ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলন ও

গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস

(২য় খণ্ড) —(যন্ত্রস্থ)

সাম্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদী জুলুম
ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে,
এবং ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনে যারা
শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

ভূমিকা

রনজিত বাবু "ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলন ও গনতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস" বইটির একটি ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ জানান। আমি তাকে স্পষ্টই বলি ভূমিকা হবে কিনা জানিনা। তবে আমার অভিমতটুকু যদি গ্রাহ্য হয়, তা ছাপাতে পারেন। আই, এন, টি, ইউ সির জন্মই হয়েছিল শ্রমিক আন্দোলনকে তার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। সরকার ও মালিকের আনুকূল্যে এটি চলত। স্বাধীনতার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্তরটি আছে তার সম্বন্ধে লিখিত বক্তব্য সমূহ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর ভূল ভ্রান্তির জন্য লেখক দায়ী নন। তবে পরিশ্রম করে তিনি তার ধ্যান ধারনা অনুযায়ী সংকলিত করে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে সে বিষয়টির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছেন, আজকের দিনে তার প্রয়োজন রয়েছে। সূত্র হিসাবে তৎকালীন "ত্রিপুবার কথা" ব্যবহার করা হয়েছে, এ থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সঠিক ধারার অগ্রগতির-চিহ্নিত পথ রেখা পাওয়া যায়।

আই, এন, টি, ইউ সির সংগঠন গুলো বিলুপ্ত প্রায় কেন? আর সি, আই টি, ইউসির সংগঠন ত্বরান্বিত হচ্ছে কেন লেখক যদি এই পরিনতির দিকে লক্ষ্য রেখে তথ্য পঞ্জীকে দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য অন্তর্গত না করে প্রথম খণ্ডেই সংযোজন করতেন তাহলে প্রথম খণ্ডটি আরোও অনেক মূল্যবান এবং সংগতিপূর্ণ হত।

বীরেন দত্ত

১১/১/৮৪ইং

লেখকের কথা

ভারতের শ্রমিক শ্রেণী এবং তার আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে বেশ কিছু বই বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ হয়েছে। এই সমস্ত রচনার অধিকাংশই প্রথম মহাযুদ্ধ সমসাময়িক কাল থেকে আন্দোলনের সময় রেখা ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। যদিও সুদূর অতীত থেকে ত্রিপুরার সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদের বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম সশস্ত্র সংগ্রাম ও হয়েছে কিন্তু এই বইগুলির অধিকাংশের কোথাও সেই শ্রমজীবি মানুষ এবং তাদের আন্দোলন সম্পর্কে সামান্যতম আলোকপাত ও করা হয়নি। একদিন যে ছিল "স্বাধীন ত্রিপুরা"—এবং আজকে স্বাধীন ভারতের অঙ্গ-রাজ্য সেই ত্রিপুরার নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস যেমন আছে তার রুটি রুজির, আন্দোলনেরও নিজস্ব একটি ধারা আছে। ইতি পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে সংগঠিত সেই আন্দোলনগুলি নিয়ে কিছু কিছু রচনা প্রকাশ হয়েছে-কিন্তু সামগ্রিক ভাবে শ্রমিক আন্দোলনের উপর ত্রিপুরায় আজও কোন পূর্ণাঙ্গ রচনা প্রকাশ হয়নি। আমি আমার ক্ষুদ্র সামর্থ নিয়ে সেই ধারাটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। দুর্বল হস্তের অগোছাল রচনাকে একটা সার্বিক সংগ্রামের ইতিহাস বলতে আমার নিজের ও সংকোচ ছিল এবং আজও আছে। বর্ত্তমান খণ্ডে আমি ত্রিপুরায় শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম তার সাংগঠনিক অবস্থা এবং শিল্পা-য়নের আদিযুগ এটুকুর মধ্যেই সীমা বদ্ধ রেখেছি। পরবর্ত্তী খণ্ডে তার আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার গোড়ার কথা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল।

ত্রিপুরার বুকে গ্রামে গঞ্জে ছিটিয়ে আছে অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি। সাম্রাজ্যবাদী জুলুম, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে যারা যৌবনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন সেই বয়োবৃদ্ধ জ্ঞান বৃদ্ধ অনেকেই-আজ আমাদের মধ্যে নেই। স্মৃতি কথন হিসাবেও তাদের বক্তব্য, অভিজ্ঞতা, ব্যথা বেদনার কাহিনীগুলি ধরে রাখার মানসিকতা আজও আমাদের হয়ে উঠল না, ট্র্যাজিডিটা এখানেই। পরিবেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সেই জ্ঞান বৃদ্ধ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগন আস্তে আস্তে নিথর মৌনতার কবলে নিজদের সঁপে

দিয়ে মুখে কুলুপ এটে শেষ দিনের প্রতীক্ষা করছেন। আমার এই সংগ্রহ ও প্রকাশের পেছনে সেই তাদের অনেকেরই প্রেরনা বিদ্যমান। কিন্তু সময়ে অসময়ে আলোচনায় সংগ্রহে সব চেয়ে বেশী উৎসাহ দিয়েছেন তার নামটুকু পর্য্যন্ত উল্লেখ না করতে বার বার অনুরোধ করেছেন। তাব ইচ্ছাকে সম্মান দেখিয়ে নাম-উল্লেখ থেকে বিরত রইলাম। সমস্ত লোভ লালসা মাতব্বরী এবং আত্ম প্রচার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে তিনি এমন আপ্রান সচেষ্ট তাঁর প্রতি আমার প্রীতিও শ্রদ্ধা রইল। শ্রদ্ধা রইল রামেশ রঞ্জন দত্ত চৌধুরীর প্রতি যিনি সুদূর হাফলং চা বাগিচা থেকে অধুনালুপ্ত ত্রিপুরার প্রথম চিনির কারখানা এবং অতীতের চা-শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। শ্রদ্ধা রইল কৈলাশহরের ডাঃ চণী ঘোষ, ত্রিপুরা সরকারের লেবার অফিসার মহেন্দ্র সিংহ, ত্রিপুরা চা-মজদুর ইউনিয়নের জন্মদাতা-অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পিতৃবন্ধু প্রাক্তন বিপ্লবী শচীন্দ্র নাথ দত্ত, দেব সেন এবং প্রীতি জানাই আমার বন্ধু ও সহকর্ম্মী পবীর পাল, দীপ্তি বিশ্বাস, মৃনালিনী দেববর্মা, এবং ভগ্নীপ্রতীম গোপা ঘোষকে যারা দিনের পর দিন আমার সংগৃহীত তথ্যগুলি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে আমার লেখায় সাহায্য করেছে।

আমার মত একজন অখ্যাত লেখক এবং টি, জি, ই. এর সাধারণ কর্ম্মীর পক্ষে ত্রিপুরা সরকারের দস্তাবেজ দেখা এবং মহাফেজ খানার প্রবেশদ্বার বন্ধ। এই বই প্রকাশের সময় পর্য্যন্ত আমি সেই সমস্ত জায়গায় ঢুকতে পারিনি। অনেক পুরানো সংবাদ পত্র, চিঠি পত্র, বক্তিগত সাক্ষাৎকার ইত্যাদির মাধ্যমে আমাকে এই তথ্য সংগ্রহের দুরূহ কাজটি সম্পূর্ণ করতে হয়েছে।

বিগত ১৯৮০ সালের ২৭শে মার্চ থেকে শ্রদ্ধেয় ভূপেন দা (ভূপেন দত্ত ভৌমিক) তাঁর দৈনিক সংবাদ এর পাতায় প্রথম রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। আংশিক প্রকাশের পর নানা কারনে বন্ধ থাকে, বন্ধু বান্ধব পাঠক মহল থেকে চাপ আসতে থাকে রচনাটিকে আরও তথ্য সমৃদ্ধ করে একটা পুর্ণাঙ্গ চিত্র যেন তুলে ধরি, পরিবর্ত্তী সময়ে "ত্রিপুরা রানার"—এর সম্পাদিকা স্নেহভাজন মিতা দাস, রচনাটি পুস্তক আকারে প্রকাশের দুঃসাহসিক দায়িত্ব রানার প্রকাশনের হাতে তুলে দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

হয়ত সুখ পাঠ্য উপন্যাস বা রম্য রচনা জাতীয় না হওয়ার ফলে

রসের কমতি থাকায় মৌলোভী পাঠক বৃন্দকে আকর্ষণে সক্ষম হবেনা, কিন্তু তাত্ত্বিক ও ইতিহাসের কারবারী মৌলবী শ্রদ্ধাভাজনদের আংশিক সহায়ক হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নমস্কারান্তে—

অফিসার্স কোয়াটার লেন
আগরতলা
১২/১/৮৪ ইং

রনজিৎ পাল

প্রকাশিকার নিবেদন

শ্রীরনজিৎ পালের 'ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলন ও গনতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস' বই প্রকাশের জন্য উৎসাহ বোধ করি এ কারণে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ অধীনে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন-শোষণ অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের তীব্র অসন্তোষ বার বার আত্ম প্রকাশ করেছিল বিদ্রোহের দুর্বার বিস্ফোরণ। বলা বাহুল্য, সেগুলি ছিল মূলত একই চরিত্রের এবং মুখ্যত একই ধারায় প্রবাহিত।

বিদ্রোহ ও বিপ্লবান্দোলনের কালবৈশাখীর মত ভারতভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের ভিত্তিমূল প্রকম্পিত করার জন্য, চরিত্রগত দিক দিয়ে সেগুলি যেমন ভিন্ন তেমনি বিভিন্ন ধারা উপধারায় প্রবাহিত।

ভারতের এই সকল বিদ্রোহ ও বিপ্লবান্দোলনের ইতিহাস আংশিক ভাবে বা খণ্ডিত ভাবে প্রকাশিত হলেও, ইহা অনস্বীকার্য যে, ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাস বই আকারে এই প্রথম প্রকাশিত হলো। এ গ্রন্থে লেখক বিভিন্ন তথ্যও ঘটনার যে বিশ্লেষণ করেছেন তার কোন কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এ জাতীয় তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশের একান্ত প্রয়োজন আছে মনে করেই দুই খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বই মেলা উপলক্ষ্যে বইটি প্রকাশ করার ইচ্ছায় স্বল্প সময়ে দ্রুত কাজ করাতে গিয়ে মুদ্রণে প্রমাদ থাকতে পারে সে জন্য সুধী পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, বইখানি সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকার নিকট সমাদৃত হলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক জ্ঞান করবো।

প্রথম পর্যায়

বিশ্বশ্রমিক আন্দোলনের পথ প্রদর্শক-প্রেরণাদাতা কার্ল মার্কস—ভারতের সমাজজীবন ও সমাজচিত্র তুলে ধরতে গিয়ে ১২৬ বছর আগে যে কথাটা বলেছেন সেই বক্তব্যের আলোকে আজো আমরা ভারতীয় সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি। ইংরাজ শাসন ও স্বাধীনতা পরবর্ত্তী সময়ে আংশিক যান্ত্রিক উন্নতির ফলে সমাজ জীবন বা সমাজ কাঠামোর কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা তাও জ্ঞান বিচারের আলোতে বিশ্লেষণের সহায়ক হয়। মার্কস বলেছেন "কৃষি ও কারুশিল্পের ঘনিষ্ট সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের সমাজ জীবনের বনিয়াদ ছিল তথা কথিত গ্রামীন সংগঠনের উপর প্রতিষ্টিত"—(সূত্র ভারতের ব্রিটিশ শাসন—কার্ল মার্কস)

পরবর্ত্তীকালে এই গ্রামীণ সংগঠন ও অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী তার ভিত্তিকে চুরমার করে দেয়। সেই ভাংগনের ঢেউ লাগে ত্রিপুরায় ও। কুটীর শিল্প নির্ভর যান্ত্রীক শিল্পনুনত ত্রিপুরাতে ব্রিটিশ শাসন ছত্র ছায়াতলে অবস্থিত থাকিয়া দরিদ্র প্রজা শোষনে সামন্ত প্রভুদের জীবন যাপন চলত, কিন্তু এরজন্য এটা ঠিকনয় যে শোষন চলবে চিরদিন। প্রতিবাদ করা, এগিয়ে যাওয়াই মানুষের চিরন্তন স্বভাব. পড়ে পড়ে মার খাওয়া মানুষের স্বভাব নয়। ত্রিপুরার মানুষ ও তাই করেছে। বাইরের আন্দোলনের ঢেউ ত্রিপুরাকেও দিয়েছে নাড়া। ত্রিপুরার বাইরের পরিস্থিতিটা সেই সময়ে কি ছিল এখন তা দেখা যাক।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে এক নতুন যান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থার উদ্ভবের সাথে সাথে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আরম্ভ হল এক নুতন সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস। প্রথমে এল পুঁজিপতি শ্রেণী এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে তাদের সৃষ্ট কলে কারখানায় নুতন আর একটি শ্রেণীর ও হল জন্ম। এই নুতন শ্রেণীই শ্রমিক শ্রেণী নামে পেল পরিচিতি। এই পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর

আবির্ভাবের ফলে ভারতের আর্থিক সামাজিক ও জন জীবনে এলো এক নুতন যুগ। নুতন ছন্দ—নবজীবনের পথে এগিয়ে যাবার দ্বন্ধ।

সারা ভারতের সাথে তাল মিলিয়ে ত্রিপুরায় তখন পর্য্যন্ত কোন আধুনিক যান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থাব উদ্ভব হয়নি এবং আবির্ভাব হয়নি পুঁজিপতি শ্রেণীরও। কারণ সামন্ত তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষিই ছিল জীবন নির্ভর বাঁচাব পরিবেশ। ট্রাইবেল সমাজে কোমবে বাঁধা তাঁত, পুরান ধাঁচের চরকা, বা জুমের চাষ করা উৎপাদিত তুলা, শিল্প সৃষ্টির উপাদান। পাছড়া, রিয়া বা রিসা সৃষ্টি পর্যন্তই ছিল সুষ্ঠ কার্য্য। ঢাকাই মসলিন সৃষ্টির চিন্তা ওটা ছিল আকাশ কুসুমেব ব্যপাব। আর এই কৃষি ও কুটির শিল্পের উপর ভিত্তি কবেই সামন্ততান্ত্রিক ত্রিপুরাব গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার মূল কাঠামো দাঁড়িয়ে ছিল। অপব দিকে এই কৃষিকে ভিত্তি কবেই ত্রিপুবাব গ্রামীণ সমাজে প্রথম শোষক ও শোষিতেব সম্পর্ক ও গড়ে উঠে। এই কৃষি ব্যবস্থা থেকেই ত্রিপুবায় প্রথম দেখা দেয় মুষ্টিমেয় ভূস্বামী গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীপতিব। এই গোষ্ঠীপতিরা কৃষককে তাব জমি থেকে উৎখাত আর উচ্ছেদ করেই ক্ষান্ত থাকেনি সঙ্গে সঙ্গে তাব কুটির শিল্পকে ও ধ্বংস কবে সৃষ্টি কবল এক বিবাট ভাসমান জন সমষ্টিব। যাবা সামান্য মজুবির বিনিময়ে বিক্রি কবল তাদেব শ্রমশক্তি এবং পবিণত হল শোষনের যন্ত্র হিসাবে। গ্রাম ত্রিপুবাব পাহাড়ে পাহাড়ে ধান কাটাব মরশুমে নোয়াখালী মুস্লিম শ্রমিক ছোট একটা বিছানা বদনা কাঁচি সম্বল কবে সোনামোড়াব পথে এগিয়ে যেত অমরপুব ও উদয়পুবেব দিকে-ছোট বেলায় সে মিছিল দেখেছি। মাস খানেক কাজ করার পর নেমে যেত নদী পথে গোমতীব বুক বেয়ে, বাঁশেব—“ভুব” বা “ছড়দা” করে। ছনেব ছাবড়ায় থেকে শ্রম বিলালেই হবেনা, মাথা গোজাব ঠাঁইওত্ করতে হবে। নয়নপুব বাজাপুর, শঙ্খবাইল, পাঁচড়াব গ্রামের মানব মুখমণ্ডল গুলি আজো চোখে পড়ে।

ত্রিপুবা ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তের এক অতি ক্ষুদ্র সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্বলিত পার্ব্বত্য স্বাধীন বাজ্য। বাজন্য আমলে ত্রিপুরার মোট আয়তন ১১১৬ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা-৩,৮২,৪৫১ জন-(সুত্র-১৩৪০ ত্রিং সনের-ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা রচিত—সেনসাস বিপোর্ট—পৃষ্ঠা ৮/১০) প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করছি-১৩২০ ত্রিং সনের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যেব আয়তন-৪,০৮৬ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা-২২,৯, ৬১৩ জন। রাজ্যের আয়

ছিল ৯,৪০, ৫০৬ টাকা-, (সুত্র-ত্রিপুরা রাজ্যে তিরিশ বছর— (খোয়াই বিভাগে) —ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত— পৃষ্ঠা-১০) রাজ্যের মোট ভুমির এক তৃতীয়াংশ ছিল কৃষি যোগ্য ভুমি, এই কৃষিও ছিল অনুন্নত,- (অপর দিকে পাহাড অঞ্চলে-চলত জুম প্রথায় চাষ)। বাকি অংশ নদী নালা এবং গভীর অরন্য পরিবেষ্টিত। আর ছিল কিছু ট্রেডিশনাল কুটির শিল্প যা তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে মোটামুটি অক্ষম ছিল। সামন্ত তান্ত্রিক ভুমি ব্যবস্থার ফলে কর্ষন যোগ্য ভুমির একটি বড অংশ ছিল ঐ সমস্ত মুষ্টিমেয় ভু-স্বামীদের হাতে। অপরদিকে আধুনিক শিল্প ব্যবস্থা এবং যোগাযোগ বিহিন ত্রিপুরার আয়ের মুল উৎসও ছিল ভুমি রাজস্ব এবং পাহাড অঞ্চলে উৎপাদিত তিল কার্পাস ইত্যাদিব রপ্তানী মাসুল। এই রপ্তানী মাসুল আদায়ের পথ ও ছিল বিচিত্র। তৎকালিন বাজ্য সরকার এই মাসুল সরাসার আদায় করতেন না। ইজারাদারের মারফতে আদায় করতেন। ইজারাদার উৎপাদকের কাছ থেকে নিষ্ঠুর ভাবে এই মাসুল নিংডে নিত। অন্যদিকে এই ভুমি রাজস্ব আদায়ের পথও ছিল অত্যন্ত নির্মম। খরা, বন্যা বা আজন্মার বছরেও কৃষক তাব খাজনা আদায় থেকে মুক্তি পেত না। কর বা ট্যাক্স আদায় থেকে কোন সবকার কখনও বিবত থাকে কিনা জানা নেই তবে সরকারের চরিত্রের উপর কবেব হাব নির্ধারণের এবং আদায়ের কায়দাটা নির্ভর করে,—

তৎকালীন সময়েব বাজ সবকাবেব বিভিন্ন আদেশ দেখলে পরিস্কার বুঝা যায় প্রজাবৃন্দকে সবকারের খাজনার সঙ্গে জীবন্ত জীবজন্ত, তবিতরকারী উপঢৌকন দিতে বাধ্য করা হ'ত, যা তৎকালীন সময়ে 'ভেট' নামে প্রচলিত ছিল,-প্রকারান্তব তা শোষণ ছাডা 'কছুই নয়। এরই পাশাপাশি ত্রিপুরার পাহাডেব কন্দরে কন্দবে চলছিল মহাজনি শোষণ,—India today and tomorrow-বই এব লেখক রজনী পাম দত্তের কথায় "ভারতীয় সমাজে মহাজন আর ঋণ কোন নূতন ব্যপার নয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক শোষণ এবং বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী শোষণের যুগে মহাজনেব ভূমিকা এক নুতন রূপ এবং নুতন তাৎপয্য গ্রহণ করিয়াছে" ত্রিপুবার ক্ষেত্রে এই শোষণ যে কত নির্ম্মম ছিল ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা এম, এ (হার্ভার্ড) কর্তৃক সংকলিত ও প্রকাশিত—১৩৪০ ত্রিং সনের ত্রিপুবা রাজ্যের সেনসাস বিবরণীর পাতায় উৎকীর্ন করা আছে। সেই বই এর ১০৭ পৃষ্টা থেকে কিছু অংশ পাঠকের অবগতিব জন্য তুলে ধরছি—

"কৃষিজাত পণ্যাদির ক্রয় বিক্রয় সাধারণত: সাহা মহাজনগণের এক

চেটিয়া ব্যবসায় হইয়া দাড়াইয়াছে, এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণ আবার নিকৃষ্ট কুসীদজীবী রূপে বিখ্যাত, রাজ্যের আন্তঃ স্থলোবস্থিত বাজার সমুহেও ইহাদের মুদীর দোকান দৃষ্ট হয়। এই সাহা মহাজন গণ কৃষিজীবীগণের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত,-ধান্য বপন করার পূর্ব্বে যখন কৃষকদের অর্থের আবশ্যক হয় তখন ইহাদের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই,সেই সময় সাধারণতঃ বার্ষিক ১৫০ হইতে ৩০০ টাকা সুদে ইহারা কর্জ্জগ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। শুধু সুদ দিয়াও ইহাদের করাল কবল হইতে হতভাগ্য কৃষিজীবীগণ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না,। কর্জ্জ দিবার সময় আবার চুক্তি থাকে যে উৎপন্ন ফসলাদি সেই মহাজনের নিকটই নির্দিষ্ট একটি দরে বিক্রয় করিতে হইবে। এই শ্রেণীর মহাজনদের দুতরফা লাভের ফলে কৃষিজীবীগনের যে কত প্রকার ক্ষতি গ্রস্থ হইতেছে বর্ণনা করা যায় না। প্রথমতঃ সেই গুরুভার সুদের চাপে তাহাদের জমি প্রায়ই মহাজনের হস্তগত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ দাদণ গ্রহণের ফলে বাজার দর হইতে কমমূল্যে মহাজনদের নিকট ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ায়। জিনিসের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তৃতীয়তঃ—মাল বিক্রয়ের কালেও ওজন করার কারসাজিতে অনেক সময়েই আর এক দফা প্রতারিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মহাজনদের পাল্লায় যাহারা পরিয়াছে তাহারা বংশ পরম্পরা ইহাদের ঋনের জের টানিয়া চলিতেছে। যাতকেরা অনেক সময় সুদ সহ আসল টাকা পরিশোধ করিতে চাহিলেও ইহারা অত্যধিক উদারতা বশতঃ প্রায়ই সুদ মাত্র গ্রহণ করিয়া আসল গ্রহণ করিতে রাজী হয় না। ফলে ধার আর ইহ জন্মেও পরিশোধ হয় না। আবার কৃষিজীবীগণের অজ্ঞতা বশতঃ নানাস্থানে হিসাবের গোলমালে এই দুষ্ট প্রকৃতির মহাজনেরা যে কত প্রকারে উহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিতেছে তাহা বলা দুষ্কর" অপরদিকে সামন্ততন্ত্রের সৃষ্ট আইনে ঋনের দায়ে ঋন গ্রস্তের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার আইনগত বিধিব্যবস্থা এই সামন্ত প্রভুরাই করে দিয়েছিলেন। ফলে ঋন গ্রস্থ কৃষকের জমি জমা মহাজনের কবলে পতিত হতে থাকে এবং মহাজন পরিনত হয় জমির স্বত্বাধিকারিতে, আর কৃষক হয় ঐ জমিতেই কৃষি শ্রমিক অথবা ভাগ চাষাতে। এই কায়দাতেই মহাজন খাজনা এবং সুদ বাবত কৃষকের শ্রমের ফলের অধিকাংশই গ্রাস করতে থাকে। এ ভাবেই ভারতের অন্যান্য অংশের মত ত্রিপুরার হতভাগ্য পাহাড়ী কৃষকের উপর তিনটি ভয়ঙ্কর শোষক শক্তি তাদের সমস্ত ভার নিয়ে চেপে বসে। সামন্ত

শাসক আদায় করে তার ভূমি রাজস্ব, এই ভূমি রাজস্বের উপর জমিদার তালুকদার-আদায় করে তাদের খাজনা, আর মহাজন—কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের প্রায় সবটুকু কেড়ে নেয় তাদের ঋনের সুদ হিসাবে।

উপজাতীদের চাহিদা খুবই কম, জুমে উৎপন্ন ফসল থেকে তার আহার্য্য, নিশাকালে আলোর ব্যবস্থা ছিল বন থেকে আহবন করা কাঠ। কার্পাস থেকে 'তুলা' এবং সেই তুলা থেকে উৎপন্ন সুতায় কোমর তাঁতে তৈরী পাছরায় তার লজ্জানিবারনের ব্যবস্থা, যে লবন দিয়ে তার দৈনন্দিন আহার্য্যটুকু সে গ্রহণ করে অতীতে সেই লবন ও পাহাড়ের নোনা মাটি থেকে সংগ্রহ করে নিত। পরবর্ত্তী সময়ে এই লবনের মারফতে ত্রিপুরার উপজাতি কৃষক প্রথম শোষনের স্বীকারে পরিণত হয়। বিশ্রামগঞ্জ পাথালিয়া ঘাটের সেই অশীতিপর বৃদ্ধ কান্দা রায়ের কথা বার বার মনে পড়ছে—১৯৬০ ইং জরীপের পর প্রাথমিক স্বত্বলিপি লিখনের সময় সে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—'বাবু পাচসের লবন আর দশ খান টেকা দিয়া দুই বছরে'—' আমার জমিখান নিল—এত বছরেও কি তার পাঁচসের লবন আর দশখান টেকার দাম উঠলনা'—না (?)-উত্তর সে দিনও আমি দিতে পারিনি—আজও সেই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাইনি। এরই পাশাপাশি সেই সময়ে রাজ-সরকারের কর্ম্মচারী বিশেষত ফরেষ্টার বাবু, দারোগা বাবু, তহশীলদার বাবু দের দৌরাত্ব ছিল আরো ভয়ঙ্কর। সুদখোর মহাজনের ঋন পরিশোধের পর কৃষক তার অবশিষ্ট ফসল নিয়ে বাজারে বিক্রয় করতে গেলে—দারোগা ফরেষ্টার বাবুদের 'প্রাপ্য দক্ষিনা' তাকে অগ্রীম মিটিয়ে দিতে হত। অনুরূপ তহশীল কাছারীতে সরকারী রাজস্ব বা খাজনা দিতে গেলে—খাজনার সাথে-তহশীলদার বাবুর প্রাপ্য ও তাকে বুঝিয়ে দিতে হত। এই সমস্ত রাজ কর্ম্মচারীরা এই ভাবে এক হাতে রাজার প্রাপ্য-আর অন্য হাতে নিজের প্রাপ্য আদায় করে বহাল তবিয়তে দিন কাটাতেন এদের এই অত্যাচারের কথা জানিয়ে রাজদরবারে নালিশ জানালে—সেই নালিশ আবার এই শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের কাছেই 'অনুসন্ধান' এবং 'ন্যায় বিচারের' জন্য প্রেরীত হত সুধী। পাঠক নিশ্চই অনুধাবন করতে পারছেন—তখন কোন ন্যায় বিচার তাদের ভাগ্যে জুটত? রাজ সরকারের এই সমস্ত কর্মচারীদের 'প্রাপ্য' তথা উৎকোচ গ্রহন পদ্ধতি এমন এক পর্য্যায়ে উঠেছিল—তখন বাধ্য হয়ে ১২৮২ ত্রিং (১৮৭২ ইং) সনে মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর সমস্ত কর্ম্মচারীদের এই ঘুস বা উৎকোচ গ্রহন সম্পর্কে হুশিয়ারী দিয়ে এক আদেশ

জারি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। (সূত্র-রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা-পৃষ্ঠা ৩৬৬) এর পর ঘুস বা উৎকোচ আদায় কিন্তু বন্ধ হয়নি—তবে পদ্ধতী কিছুটা পরিবর্ত্তন হয়েছিল। অপর দিকে ঐ সমস্ত মামলা কর্ম্মচারীদের প্রাপ্য মিটিয়ে দরিদ্র কৃষক ঘরে যা নিতেন তাতে তার দৈনান্দিন সংসার খরচ ও চলতনা।

এখন সরকারী যে আদেশে দরিদ্র কৃষক প্রজাকে খাজনার সাথে জীবন্ত জীব জন্তুকে'ও ভেট বা নজরানা হিসাবে রাজ সরকারে 'ফার্ড' দিতে হত তার অনুলিপি নীচে দিলাম। এই আদেশটি থেকে অনুধাবন করা যাবে তৎকালীন সময়ে সরকারী আদেশে কিভাবে প্রজা শোষন চলত। আদেশটি আজ থেকে ১০২ বছর আগের।

শ্রীশ্রীদূর্গা

শ্রীগোবিন্দ
আশ্রিয়

নং চিঠি তলব মামূলী জিনিসাত রোশনাবাদ জমিদারী শ্রী শ্রীযুত মহারাজ বীর চন্দ্র মাণিক্য পং পাথর ঘাটা অন্ত:পতি মৌং ইজারা শ্রীযুক্ত গৌরী চরণ ঠাকুরের প্রতি—

আসামী			জিনিস
খাসী	—	—	× ×
পাটা	—	–	একগোট
কবুতর	—	—	×
মানকচু	—	—	×
চই	—	—	×

মং একপদ মাত্র

চিঠি দর্শন উক্ত জিনিসাত বর্ত্তমান মাসের ২৫ তারিখ চাকলার কাছারীতে দাখিল করিবা। ইতি—সন-১২২৭ ত্রিপুরা তাং ২১ পৌষ

স্বা: শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী

এঃ মোহরার।

(সূত্র—মনিময় দেববর্মা রচিত-দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় ধারা বাহিক ভাবে প্রকাশিত। "ত্রিপুরার প্রজা আন্দোলন: কিছু তথ্য"

'এই 'ভেট' বা 'উপঢৌকন' প্রজাবৃন্দকে শুভ পুন্যাহ উপলক্ষে আগমনের জন্য

তাদেরকে তাদের আপ্যায়নের জন্য ব্যয়িত হত। প্রকারান্তরে কৈ মাছের তেলে কৈ মাছ ভাজা ছাড়া আর কিছুই নয়'।

আর একটি আদেশের নকল—যে আদেশে রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদেশটির বয়স ৫৭ বছর।

পঞ্চবিংশ ভাগ
তৃতীয় সংখ্যা
জৈষ্ঠ, প্রথম পক্ষ, ১৩৩৬ ত্রিং

ম্যানেজারী অফিস। আগরতলা
পূণ্যাহের আমদানী ও বার্ষিক
আমদানীর উৎকর্ষ।

মেমো নং—২০

সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে পূণ্যাহের আমদানীর ও বার্ষিক আমদানী এবং বন্দোবস্তের উৎকর্ষ সাধন উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া সঙ্গত বোধে নিম্ন লিখিত নিয়ম প্রবর্ত্তন করা যাইতেছে।—

১। সমগ্র চাকলা রোশনাবাদ ও শ্রীহট্ট জমিদারীর তহশীল কাছারী সমুহস্থিতের অনুপাতেই নিম্নোক্ত ২ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল :—

প্রথম শ্রেণী—বার্ষিক মং ১০০০০ টাকার উর্দ্ধস্থিতের।

দ্বিতীয় শ্রেণী :—বার্ষিক মং ১০০০০ টাকার তৎনিম্ন।

সমগ্র চাকলা রোশনাবাদ ও শ্রীহট্ট জমিদারীর প্রথম শ্রেণীর তহশীলের জন্য ৫০ টাকা হারে ২টি বিশেষ পুরস্কার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তহশীলের জন্য ৩০ টাকা হারে ২টি বিশেষ পুরস্কার ঘোষনা করা যায়। বার্ষিক আদায় ও বন্দোবস্তের ফলের জন্য একটি এবং পূণ্যাহের আমদানীর জন্য অপরটি দেওয়া হইবে।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সেন।

ম্যানেজার চাকলা রোশনাবাদ ইষ্টেট।

(সূত্র :—শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় সংকলিত ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন পৃষ্ঠা-২৪৩-২৪৪)

অনুরূপ ১৩৫৯ ত্রিং সনের ২২ নং সারকুলারের মারফতে জানা যায় যে, 'পার্ব্বত্য প্রজাদের ঘর চুক্তির কর বর্ষ মধ্যে আদায় করিতে পারিলে 'সংশ্লিষ্ট' রায়গণকে (সর্দার গণকে) ৮ হাত রজাই ছিট, ১৪ হাত মাটা এবং ১ টাকা নগদ, খোরাকী হিসাবে রাজ সরকার থেকে ইনাম, বকশিস দেওয়ার প্রথা ছিল। স্বভাবতই এই পুরস্কারের লোভে ঐ সমস্ত রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরা তাদের 'এলেম' অর্থাৎ যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ

করবে—তাতে কোন দ্বিমত নেই। এমনিতেই তৎকালীন এই সমস্ত রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরা এক এক জন ছিলেন ক্ষুদে রাজা। শোষণ এর জীবন্ত প্রতীক। তেমনি এই ইনাম বকশিসের লোভে সেই সমস্ত রায়/সর্দার গন বিবেক বর্জিত হয়ে ঘর চুক্তি কর আদায়ের মাঠে নেমে পড়তেন—এ যেন—

'দ্বিধাহীন চণ্ডালের আদেশে
আদিম কুকুর চাহে
ধরণীর বক্ষ কেড়ে নিতে',—

ফলে সরকারী রাজস্ব এবং ঘর চুক্তি কর পরিশোধের তাগিদে কৃষক প্রথমে তার চাষের জমি ঐ সমস্ত ভূ-স্বামী বা জোতদার মহাজনের কাছে বিক্রি বা বন্ধক রেখে পরিশোধ করত যা পরবর্ত্তী সময়ে আর সে ফেরত নিতে সক্ষম হত না। শুধু জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েই যদি সে নিষ্কৃতি পেত তা হলেও কিছুটা রেহাই ছিল কিন্তু সরকারী আদেশে তার সামান্য অস্থায়ী তৈজস পত্র ও অগ্রিম ক্রোক করে সরকারী দাবী আদায়ের ঢালাও আদেশ ছিল।

এমনি একটি আদেশের নকল নীচে দিলাম যা থেকে উপলব্ধি করা যায় প্রজার উপর এ জাতীয় "রাজকীয় নিষ্পেসন কতটুকু ছিল।
(আদেশটি ৫৬ বছর আগের)

রাজস্ব ও সাধারণ বিভাগ
দ্বাবিংশ ভাগ, প্রথম ভাগ
বৈশাখ— ১ম পক্ষ, ১৩৩৩ ত্রিং
নাজাই দাবী পাওয়ার ব্যবস্থা
সন ১৩৩২ ত্রিং তাং ২৫ শে চৈত্র

সার কুলার নং ১৮ নাজাই ১ দাবা বাদ দেওয়া উপলক্ষে দেখা গিয়াছে সে পার্ব্বত্য প্রজাগণের ঘর চুক্তি করের বাবত ৩/৪ বৎসরের বকেয়া দাবী একত্র করিয়া সংশিত দেওয়া হয় এবং সংশিত নথির সৃষ্টি হইয়া দাবী আদায়ের অনুষ্ঠান হইলে পর দায়িকের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না বলিয়া দাবী নাজাই উল্লেখে বাদ দেওয়ার জন্য বিভাগীয় অফিস হইতে প্রস্তাব আগত হইয়া থাকে; এরূপ কার্য্য রীতি বিরুদ্ধ এবং সরকারী ক্ষতি জনক।

যথা কালে এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান হইলে সরকারী প্রাপ্য দাবী নাজাই হওয়ার কারন নাই। এতদ সম্বন্ধে তহশীল সংক্রান্ত কর্মচারীগনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা বাঞ্ছনীয় কারণ কোন তহশীল কর্মচারী উক্ত আইনের বিধানানুযায়ী কার্য্য না করিলে এবং তজ্জন্য সরকারী দাবী নাজাই হওয়ার কারণ হইলে ঐ দাবীর জন্য সংশ্লিষ্ট তহশীল কর্মচারীকে দায়ী করা হইবে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাসগুপ্ত

মন্ত্রী

(সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন—পৃঃ ১২৩)

এভাবে একদিকে মহাজনী শোষণ, সরকারী নিষ্পেসন এবং অপর দিকে সামন্ত প্রভুদের ভূমি বন্দোবস্ত আইনে সৃষ্ট ভূ-স্বামীদের জমির মালিক এবং জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদের আইন সম্মত বিধি-ব্যবস্থা সৃষ্টি করে যে ভাসমান জন সমষ্টিব সৃষ্টি করে সমাজের সেই অংশের লোকেরা—শরৎ চন্দ্রের "গফুরেব" মত "আল্লার কাছে" অভিযোগ জানিয়ে যেত। ক্ষেত মজুর পাবলিক ওয়ার্কস—এর রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাঁধ, খাল তৈরী, বাগানের কাজ ইত্যাদি কাজে শ্রমের বিনিময়ে প্রথম মজুরী উপার্জক হিসাবে আবিভূত হয়। এই শ্রেণীকেই ত্রিপুরাব হাল আমলেব শ্রমিক শ্রেণীর জনক বলা যায়।

আদি যুগের সেই শ্রমিকদের সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি কেমন ছিল—অগ্রজ কবি শ্রদ্ধেয় মনিময় দেববর্মার একটি কবিতার কয়েকটি লাইনেই পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছে—

"যাদের টংঘরে বাস,
অর্দ্ধ নগ্ন কটি-বাস

অন্নহীন আদিবাসী"—সেই সমস্ত শ্রমিকদের রাজকীয় আদেশ অনুযায়ী দৈনিক মজুরীর হার ছিল—পুরুষ শ্রমিক—।. (চার আনা) এবং একজন স্ত্রী শ্রমিক (তিন আনা) শিশু শ্রমিকের মজুরী সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট হার ছিল না, অপর দিকে "লাহার" ও "তাই থুং" প্রথা তথা বেগার শ্রম প্রথা প্রজাদের উপর বাধ্যতামূলক ছিল।

ত্রিপুরার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য রাজ সরকারের সিপাহীদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের সময় রাস্তার ছন, বাঁশ, জঙ্গল ইত্যাদি কেটে পথ পরিস্কার করা, ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে

খাওয়া, স্বল্প মূল্যে আহার্য্যের যোগান ও রাত্রিতে থাকার ব্যবস্থা করার যে প্রথা বা রীতি ছিল তাকেই বলা হতো "লাহার" কার্যত এই বেগার খাটার পরিশ্রম করতে হতো সাধারণ পার্ব্বত্য প্রজাদের যা পার্শ্ববর্তী রাজ্য গুলিতে আদৌ ছিল না।

(সূত্র "গোমতী"—২৪/১২/৭৪ ইং সংখ্যা)

আর সরকারী কর্মচারীদের সরকারী কার্য্যে যাতায়াতের সময় তাদের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র বিনা পারিশ্রমিকে/স্বল্প পারিশ্রমিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করার যে বাধ্যতা মূলক রীতি ছিল তাকে বলা হতো "তাইথুং" প্রথা—"লাহার" প্রথা থেকে "তাইথুং" প্রথা কিছুটা উন্নত ছিল কারণ এই প্রথার মাধ্যমে শ্রমিকদের সামান্য কিছু পারিশ্রমিক দেওয়ার ও প্রথা ছিল,

(সূত্রঃ ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলনঃ পৃষ্ঠা ৩৪)

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত ত্রিপুরায় সে সময়ে "ক্রীতদাস প্রথা" ও প্রচলিত ছিল। (সূত্র—রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা পৃঃ ৩৫)। তৎকালিন সমাজ ব্যবস্থায় এই দাসদাসী যেমন বাজারে ক্রয়-বিক্রয় চলত তেমনি ঋণ পরিশোধে অপারগ ব্যক্তি নিজকে নিজে খাতকের কাছে বিক্রয় অথবা বন্ধক রাখার প্রথা ও চালু ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করছি— "উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ইংল্যাণ্ডে ঘৃণ্য ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল, তার বিরুদ্ধে উইলবার ফোর্সের নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে ইংরাজ সরকার বাধ্য হয়ে ১৮৩৫ খৃঃ ১ অগাষ্ট "এমানসিপেশান অ্যাক্ট" পাস করে—এবং ১৮৪০ খৃঃ থেকে ঐ রাজ্যে দাস প্রথার বিলোপ হয়। ১৮৬৫ খৃঃ আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধের সময়ে দাস-প্রথা রহিত হয়। "দাস" নামক মানুষদের কে পশুর মত বেগার খাটানো হত এবং কতো বীভৎস ছিল তাদের উপর অত্যাচার তা জগতবাসীকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন মার্কিন লেখিকা হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বীচার ষ্টো। তাঁর "আঙ্কল টমস্ কেবিন" আজো আমাদের অশ্রুসিক্ত করে। উনিশ শতকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সাধের উপনিবেশ ভারতবর্ষেও নানা স্থানে ছিল এই দাস প্রথা"—উনিশ শতকের শেষ দিকে এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে এক সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয়। —এই মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ নৃপতি শাসিত ত্রিপুরার সীমান্তে এসে ধাক্কা দেয়।

কুমিল্লাতে তখন ব্রাহ্ম সমাজের অনেক শিষ্য ও হয়েছে। তারই ফলশ্রুতি "স্বাধীন ত্রিপুরা খাস আপিল আদালত" —এই দাস দাসী ক্রয়-বিক্রয় বন্ধক নিষিদ্ধ করে—১২৮৮ ত্রিং ১৭ই আষাঢ় (১৮৭৮ইং) নীচের আদেশটি ঘোষণা করে—

সদর কাছারীর মোহর

—ঘোষনা পত্র—

অত্যকার আদেশানুসারে সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে নিম্ন লিখিত বিষয় ইহা দ্বারা ঘোষনা করা হইল—

১।

কেহ কোন ব্যক্তিকে দাস দাসী বলিয়া ক্রয় কি বিক্রয় করিতে অথবা বন্ধক দিতে কিংবা রাখিতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির গৃহে ঐ প্রকার কেহ ক্রতভাবে অথবা বন্ধক স্বরূপে থাকিলে যদি সে আপন ইচ্ছানুসারে ঐ অবস্থা এড়াইয়া যাইতে চাহে তবে তাহাকে ঐ গৃহস্বামী কোনরূপ আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না।

২। এই ঘোষণা প্রচারের পূর্ব্বে যদি কোন ব্যক্তি কাহার নিকট নগদ টাকা গ্রহণে বিক্রীত কি বন্ধক স্বরূপে থাকিয়া কার্য্যে নিযুক্ত থাকে ও ঐক্ষণ সে ঐ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া যাইতে চাহে তবে সে যত সময় কার্য্য করিয়াছে তৎবাবত বালক হইলে বার্ষিক ১২ (বার) টাকা এবং বয়োধিক হইলে বার্ষিক ২০ (বিশ) টাকা হিসাবে ঐ গৃহীত টাকার মধ্যে বাদ পরিয়া আরও কিছু পাওনা থাকিলে তাহাকে ঐ অবশিষ্ট টাকার পরিবর্ত্তে উক্ত নিয়মমিত আর যতদিন আবশ্যক হয় ততদিন তাহাকে টাকার স্বরূপ খাটিতে হইবে।

৩।

এই ঘোষণা প্রচারের পর কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ১ এবং ২ দফার নিয়মের বিরুদ্ধে আচরণ হওয়া প্রমাণিত হইলে দণ্ড সম্বন্ধীয় যে বিধি এইক্ষণ প্রচলিত আছে কিংবা উত্তর কালে প্রকাশিত হইবে। তদনুসারে ক্ষমতাপন্ন বিচারাদালতের দ্বারা দণ্ডের যোগ্য হইবে।

৪। পরস্পর সম্মতির সহিত অগ্রিম বেতন কিংবা মাস মাস বেতন দেওয়ার নিয়মে চাকর অথবা চাকরানী রাখার প্রথা পূর্ব্বাবধি আছে তাহা রহিত করা এই ঘোষণার উদ্দেশ্য নহে। কেবল মাত্র প্রয়োজনে যে

এতৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান রীতি কিংবা ভবিষ্যতে প্রচারিত বিধি অনুসারে উভয়ের মধ্যে চুক্তি নির্দ্ধারিত থাকিবে ঐ চুক্তির ম্যাদ তিন দিবসের অধিক হইবে না কেহ অবৈধ ভাবে ঐ চুক্তি ভঙ্গ করিলে এই স্বাধীন রাজ্যে স্থাপিত উপযুক্ত আদালত দ্বারা চুক্তি প্রতিপালনের উচিত উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে। ইতি—সন ১২৮৮ ত্রিং তারিখ ১৭ই আষাঢ়

Sd/ Mukunda Ram Roy

মাস আপীল বিচারপতি

(সূত্র :— রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা— পৃষ্ঠা ৯৫—৯৬)

"১৮৭৮-৭৯ সালের Bengal Administrative Repoat থেকে জানা যায় বেশ কিছু সংখ্যক ক্রীতদাস এই ঘোষণার সুযোগে মুক্তি পেয়েছিল"—

(সূত্র-রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা—পৃষ্ঠা—৩৫)

আর এক শ্রেণীর ক্রীতদাস ও তৎকালীন সময়ে এ রাজ্যে ছিল। তাদেরকে বলা হত "জোলাই" অথবা জুলাই। এরা আদিবাসী সম্প্রদায়। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী মহারানী, যুবরাজ, এবং রাজ পরিবারের অন্যান্যদের ব্যক্তিগত খেদমতে এরা নিযুক্ত হত। এদের জীবন যাপন ও ক্রীতদাসের মতই ছিল। সমাজে এদের কোন স্থান ছিল না। পরবর্ত্তী এক আদেশে এই প্রথাও কিছুটা বিলুপ্ত হয়।

(সূত্র রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা, পৃষ্ঠা—৯৮, রাজমালা—কালী-প্রসন্ন সেন পৃষ্ঠা-২১৮)

এই ভাবে রাজ সরকারের কর্মচারীদের খেদমতে বিনা পরিশ্রমে, স্বল্প পরিশ্রমে কোন পার্বত্য প্রজাকে যেমন শ্রম দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল তেমনি বৃহৎ ভূ-স্বামী, গোষ্টি পতি এবং সর্দ্দারদের খেজমতে ঐ সমগ্র গ্রামীণ শ্রমিককে বেগার শ্রম দিতে হতো, সেই সময়ে শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা কারী কোম শ্রমিক সংগটন যেমন সৃষ্টি হয়নি ঠিক তেমনি ঐ শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন সরকারী আইন কানুন বা দপ্তরের ও সৃষ্টি হয়নি। এক কথায় শ্রমিক শোষণ যেমন অবাধে চলছে অপর দিকে দাস শ্রমিক প্রথা পুরোদমে পাল্লা দিয়ে চলছে—নূতন সমাজ সৃষ্টির উপাদান হিসাবে।

ত্রিপুরার শ্রমজীবী শ্রেণীর জন্ম—সুতিকা গৃহের পরিবেশ হল এই,—

উপনিবেশ ভারতের অন্যান্য অংশের মত জমি থেকে উৎখাত এবং কুটির শিল্প থেকে বিতাবিত এই বিরাট সংখ্যক মানুষ রূপান্তরিত হল সর্বহারা শ্রেণীতে,—"আধুনিক ধনতন্ত্রের গৃহেই সর্বহারা শ্রেণী জন্ম নেয় না,—সামন্ত যুগেও বহু মানুষের আবির্ভাব ঘটে-যাদের নিজদের মেহেনত মজুরীর বিনিময়ে বিক্রি করতে হয়, তাদের হারাবার কিছু থাকে না। কিন্তু একথা ঠিক যে এসব সর্বহারা মানুষ নির্দিষ্ট এক বৃত্তে মজুরী উপার্জক শ্রেণী হিসাবে টিকে থাকেনা। তারা যেন মেহেনত বিক্রির এক চলমান স্রোত। কিন্তু কখনও তারা ইতিহাসের ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। ভারতের জনগণের ইতিহাসে বহু অভ্যুত্থানের উপাদান' এই শ্রমিক শ্রেণী রেখে গেছেন, —তেমনি ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এই শ্রেণীর অবদান ও কম নয়।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

ত্রিপুরায় শিল্পায়নে প্রাথমিক যুগ—

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ দিকে ভারতে শিল্প ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে যখন দ্রুত শিল্পায়ন হতে চলেছে—ত্রিপুরার সবুজ বনানীর ঘুম কিন্তু তখনও ভাঙ্গেনা। এই শতাব্দির প্রথম দশকে, এক বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পার্ব্বতী ত্রিপুরা বাগিচা শিল্পের মাধ্যমে প্রথম শিল্পায়নের যুগে প্রবেশ করে। ত্রিপুরায় এই বাগিচা শিল্প গড়ে তোলার পেছনে অনেক করুন ইতিহাস আছে।

১৮৩৯খৃঃ থেকে ব্রিটিশ পুঁজিতে ভারতে প্রথম বাগিচা শিল্প গড়ে উঠে, এ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে পাঁচলক্ষ পাউণ্ড এর ব্রিটিশ পুঁজি নিয়ে আসাম ও কাছাড় জেলায় প্রথম—"আসাম টী কোম্পানী"—প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীরা 'ইনডেনচার' শ্রমিক নিয়োগ করে এই শিল্প চালু করে। ব্রিটিশ উপনিবেশ বাদীদের ষ্টীম রোলারে বাংলাদেশের পুরানো সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যেমন ধ্বংস হয়—তেমনি সরকারের প্রবর্তিত নুতন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ফলে সামন্ততন্ত্র এক নুতন জীবন লাভ করে। ফলে সারা দেশ জুড়ে এক ভাসমান জন সমষ্টির সৃষ্টি হয়। এই

ভাসমান জন সমষ্টিই পরবর্ত্তী সময়ে আসাম এবং বিভিন্ন ব্রিটিশ উপনিবেশে বাগিচা শ্রমিকে পরিণত হয়। এই সময় তৎকালিন চা-বাগিচা শিল্পের মালিকদের জন্য 'ইনডেনচার' শ্রমিকের ব্যবস্থা যেমন চালু ছিল তেমনি ব্রিটিশ সরকার 'ওয়ার্কস মেনস ব্রিচ অফ কণ্ট্রাক্ট অ্যাক্ট' তৈরী করে দিয়ে ঐ সমস্ত বাগান মালিকদের আরও সুযোগ করে দেয়। ফলে 'বেয়ারা' অথবা কাজ করতে অনিচ্ছুক শ্রমিক কে 'সায়েস্তা' করতে—ঐ সমস্ত মালিকরা 'ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড'—এর মাধ্যমে প্রয়োগ করত, এ—কায়দার আড়ালে তাড়া ভারতে দাসশ্রমিক প্রথা বহাল রাখে (সূত্র—ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস—গোপাল ঘোষ)

আসাম এবং কাছার জেলায় বাগিচা শিল্প গড়ে উঠার অনেক পড়ে ত্রিপুরায় এই শিল্প গড়ে উঠে। প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উল্লেখ করছি মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুরের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসকদের আমলে ত্রিপুরায় চা-চাষ তথা চা-বাগিচা গড়ে তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। মনে হয় মুখ্যত দু'টি কারণে তৎকালিন শাসক বর্গ এই শিল্প ত্রিপুরায় গড়ে উঠুক চাননি। কিভাবে চা—বাগিচার জন্য শ্রমিক সংগ্রহ করে জাহাজে করে কলকাতা থেকে আসাম ও কাছাড়ে 'চালান' দেওয়া হত, এবং সেখানে তা দর দিয়ে কিভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া হত ইত্যাদির বিবরণ তৎকালিন 'সোম প্রকাশ," "রিফর্ম' "ঢাকা প্রকাশ" ইত্যাদি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল। তৎকালিন সামন্ত শাসক বৃন্দ হয়ত এগুলি দেখেছিলেন। অনুরূপ সীমান্ত সংলগ্ন চা-বাগিচ গুলিতে ইংরাজ মালিক ও তাদের কর্মচারীদের চা-শ্রমিকদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার, শোষন এবং তাদের দাস শ্রমিকের জীবন, বাংলার বুকে নীল চাষ এবং নীল করের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই সময় সীমান্ত সংলগ্ন চা বাগানের অনেক শ্রমিক বাগান মালিক এবং তার কর্ম্মচারীদের অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করতে না পারলে—এপারে পালিয়ে এসে রাজ সরকারের আশ্রয় গ্রহণ করত। সরকার থেকে এই সমস্ত পালিয়ে আসা কুলিদের শুধু আশ্রয়-ই দিতেন না অনেক সময় প্রজা হিসাবে স্বল্প নজরানায় আবাদের প্রয়োজনে জংলা ভূমি বন্দোবস্ত ও দেওয়া হত। বর্ত্তমান খোয়াই বিভাগের সীমান্ত সংলগ্ন অনেক সমতল ভূমি এই প্রজাদের দ্বারাই আবাদিত। খোয়াই বিভাগের সরকারী নথী পত্র পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় এই সমস্ত

পালিয়ে আসা শ্রমিকদের আশ্রয়ের ব্যপার নিয়ে বাগান মালিক এবং ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের সাথে স্থানীয় শাসক কর্ত্তৃপক্ষের বহু মনোমালিন্য ও হয়েছিল। (সুত্র—"খোয়াই বিবরণী—ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত) এই সমস্ত কারণেই তৎকালিন সামন্ত শাসক বৃন্দ ত্রিপুরার বুকে চা-য়ের চাষ নিষিদ্ধ করেছিলেন।

চা সম্পর্কে—আব একটি ঘটনাব উল্লেখ করে এ পর্য্যায়ের ইতি টানছি—"Father of Tea in India—" এবং government Tea Forest এব প্রথম Superintendent—Mr. C. A Bruce এর ১৮৩৮ খৃঃ এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ভাবতবর্ষের পুর্ব্বাঞ্চলের পাহাডগুলিতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা মনিপুব এবং ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে চা গাছ প্রকৃতিব নিয়মে সৃষ্টি হয়েছিল এবং বৃদ্ধি ও পাচ্ছিল। তবে এগুলি ছিল বন্য চা। কিন্তু পাহাডী জনসাধারণ চায়ের ব্যবহার জানত না তবে তাদের অসুস্থতার সময় এই চা-পাতা সিদ্ধ রস আরক হিসাবে ব্যবহার করত। অন্যদিকে এই চা গাছের ফুল যা দেখতে খুবই সুন্দর পাহাডী মেয়েরা তাদের সৌন্দর্য্য চর্চায় ব্যবহাব কবত। পবনর্ত্তী সময় পেশাগত কারনে যখন লঙ্গাই, কাঞ্চনপুব অঞ্চলে গিয়েছ তখন দেখেছি এতদঞ্চলের বসবাসকারী পাহাডী লোকজনদেব প্রায় বাডীতেই এই জংলী চা গাছ আছে। এর ডাল সহ কাঁচা পাতা বান্নাব চুল্লিব উপব বিছিয়ে দিয়ে অর্থাৎ টোষ্ট করে তাদের দৈনন্দিন ব্যবহায্য চা পাতা হিসাবে ব্যবহার করে। পেশাগত কাবণে যখনই কোন বাড়ীতে গিয়েছি এই চা পাতার তৈবী চা পান ও কবেছি।

ত্রিপুবায় বাগিচা শিল্প গডে উঠার প্রাথমিকস্তরে ভারতের জাতীয় আন্দোলন থেকে উদবুদ্ধ স্বাদেশিকতা অনেকটা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

১৯০৫ খৃঃ ভারতের জাতীয় আন্দোলনে বিদেশী জিনিষ বয়কট এব প্রস্তাব গ্রহণ কবা হয়, এই বিদেশী জিনিষ বর্জ্জনেব আন্দোলনের ফলে একদিকে যেমন ব্রিটিশ পুজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত লাগে তেমনি অন্যদিকে ভাবতে নূতন ভাবে শিল্প বিকাশের দ্বার খুলে যায়। এই বয়কট আন্দোলনেব মধ্যে দিয়ে ভারতে স্বদেশী শিল্প গডাব যে দাবী উঠে তার ঢেউ ত্রিপুবাব পার্শ্ববর্ত্তী সামান্ত সংলগ্ন বাংলা দেশে ও এসে ধাক্কা লাগে, ফলে এখানেও কিছুটা আলোডন তোলে। এই সময় ভারতের বুদ্ধিজীবি

শ্রেণী পত্র পত্রিকা এবং বক্তৃতার মাধ্যমে জোরদার ভাবে এইদাবী জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেন। এই আন্দোলনের মধ্যে যেমন জনগণের দীর্ঘদিনের ক্ষোভ এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পায় তেমনি এই আন্দোলনের মধ্যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা নেতৃত্বে থাকায় তা স্বদেশী শিল্পের নামে দেশী ধনতন্ত্রবাদের দ্বার খুলে দেয়। এই দৃষ্টি ভঙ্গী থেকেই ১৯১৬ খৃঃ (১৩২৬ ত্রিং সনে) কতিপয় বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি, বাঙ্গালী পুঁজিতে এবং রাজন্য বর্গের প্রচ্ছন্ন সহায়তায় ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাশহর মহকুমায় হীরাছড়া গ্রামে "হীরাছড়া চা-বাগান" সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম চা বাগান শিল্পের গোড়াপত্তন করেন। অপর দিকে ত্রিপুরার জমির অবস্থা চা চাষের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল এবং সীমান্ত সংলগ্ন ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চলে অনেক আগে থেকেই চা বাগান স্থাপিত হয়েছিল। এই সময়ে চা-এর ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক দেখে এবং আসাম অথবা বাংলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চা চাষের উপযোগী স্থানের অভাবে এ রাজ্যের বিস্তির্ণ অকাষত ভূমির প্রতি বাংলা দেশের ধনী মহাজন এবং জমিদার যারা তাদের পুঁজি জমি থেকে ব্যবসায় নিয়োগ করছিলেন, তাদের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হয়। ফলে এ রাজ্যে চা বাগান খোলার জন্য অনেক যৌথ কারবারেরও সৃষ্টি হয়। রাজ সরকার ও যখন দেখলেন—এই একটি শিল্প থেকে রপ্তানী শুল্ক এবং ভূমি রাজস্ব খাতে রাজ্যের বিরাট আয়ের সম্ভাবনা, তখন চা-বাগান প্রস্তুত ভূমি বন্দোবস্ত ইত্যাদির উপর আইন প্রনয়ন করে রাজ্যে ঢালাও ভাবে চা-বাগান করার অনুমতি দিতে আরম্ভ করলেন। ১৩২৬ ত্রিং সনে ত্রিপুরার রাজদরবারে যে আইন মঞ্জুর হয়েছিল এখানে হুবহু তুলে ধরছি—

ত্রিপুরা রাজ্য

চা বাগান প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ভূমির বন্দোবস্ত গ্রহণ

এবং

ভূমি ও প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিবরণ।

১৩২৭ ত্রিপুরাব্দ

স্বাধীন ত্রিপুরা

রাজধানী আগরতলা

চিফ্ দেওয়ান অফিস—রাজস্ব বিভাগ

"চা-কৃষির নিমিত্ত ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী" ত্রিপুরা রাজ্যে চা-কৃষির চাষ পরিচালন সম্বন্ধে দরবার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত নিয়মাবলী মঞ্জুর হইয়াছে—

ক) রাজস্ব ; ভূমির প্রকৃতি এবং সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দ্রোন প্রতি ৬ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত রাজস্ব অবধারণ করা হইবে।

খ) নজর :—এক বৎসরের রাজস্ব পরিমাণ টাকা নজর স্বরূপ প্রদান করিতে হইবে।

গ) শুল্ক :—কলিকাতার নীলামী মূল্যের বাজার দরের উপর শতকরা ২ ৷, টাকা রপ্তানী শুল্ক প্রদান করিতে হইবে।

ঘ) ২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত প্রদান করা হইবে, তন্মধ্যে প্রথম তিন বৎসর মিনাহ প্রদান করা যাইবে। প্রতি ২০ বৎসরান্তে পূর্ব্ব মুদ্দতের জমার উপর টাকা প্রতি ২ আনা বৃদ্ধি জমা প্রদান করিতে সম্মত হইলে, পুণর্ব্বার ২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। এবম্বিধ পুর্ণবন্দোবস্ত গ্রহণ, বন্দোবস্ত গ্রহীতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে।

ঙ) যে সকল ব্যক্তি তালুক বা জমিদারী স্বত্বে বর্ত্তমান সময়ে ভূমির অধিকারী, এই নিয়মাবলীর রাজস্ব অবধারণ সম্বন্ধীয় বিধান তাঁহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না, কিন্তু (খ) ও (গ) দফা অনুসারে নজর ও শুল্ক দেয় হইবে।

শ্রীকালী প্রসন্ন সেনগুপ্ত,
সেরেস্তাদার।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাসগুপ্ত,
চিফ্ দেওয়ান
২৩—৭-২৬ ত্রিং

স্বাধীন ত্রিপুরা

রাজধানী আগরতলা

চিফ্ দেওয়ান অফিস—রাজস্ব বিভাগ

চা-কৃষি উৎপাদনার্থে ভূমি বন্দোবস্ত সম্বন্ধীয় পাট্টা ও কবুলিয়তের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত সর্ত্ত ত্রিপুরা রাজ্যে চা-কৃষি উৎপাদনার্থে যে সকল ভূমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়, তাহার পাট্টা কবুলিয়তের নিমিত্ত নিম্নোক্ত সর্ত্ত নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। বন্দোবস্ত গ্রহীতা উক্ত সর্ত্তযুক্ত কবুলিয়ত দাখিল করিয়া পাট্টা গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(১) বন্দোবস্ত কৃত ভূমি আবাদ করিবার নিমিত্ত বন্দোবস্তের সময় হইতে তিন বৎসর মিনাহ মুদ্দত প্রদান করা হইবে।

(২) বন্দোবস্ত গ্রহীতা ব্যয়ে সরকারী আমীন দ্বারা চৌহদ্দির অন্তর্গত ভূমি জরিপ হইয়া যে পরিমাণ ভূমি সাব্যস্ত হইবে, তাহার দ্রোণ প্রতি (ভূমির প্রকৃতি এবং সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া) ৬ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্য্যন্ত রাজস্ব এবং রাজস্বের তোলা প্রতি এক আনা হারে পথকর নির্দ্ধারিত কিস্তি অনুসারে সংসৃষ্ট ট্রেজুরীতে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) কিস্তি খেলাপ করিলে, শতকরা মাসিক ১ এক টাকা হারে কিস্তি খেলাপি সুদ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) রপ্তানীকৃত চায়ের নিমিত্ত কলিকাতায় নীলামী মূল্যের উপর শতকরা ২॥ আড়াই টাকা হিসাবে রপ্তানী শুল্ক প্রদান করিতে বন্দোবস্ত গ্রহীতা বাধ্য থাকিবে।

(৫) বন্দোবস্তের ম্যাদ বন্দোবস্তের সময় হইতে ২০ বিশ বৎসর কাল গণ্য হইবে। ঐ ম্যাদ অতীতে এবং তৎপর প্রতি ২০ বৎসর অন্তে, তৎপূর্ব্ব মুদ্দতের জমার উপর প্রতি টাকায় ২ আনা হারে বৃদ্ধি জমা এবং এক আনা হারে পথকর প্রদান করিতে সম্মত হইলে, পুনর্ব্বার ২০ বৎসর ম্যাদে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে। এবম্বিধ পুনবন্দোবস্ত গ্রহণ, বন্দোবস্ত গ্রহীতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তদ্রূপ বন্দোবস্ত গ্রহণ না করিলে ভূমি নিরাপত্তিতে খাস দখলে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং তাহা অন্যত্র পত্তন করা যাইবে।

(৬) রাজস্ব পরিশোধ পক্ষে ত্রুটি বা শৈথিল্য করিলে বর্ত্তমান প্রচলিত আইন ও ভবিষ্যতে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে যে কোন আইন প্রচলন হইবে, তদনুসারে বন্দোবস্তের অন্তর্গত ভূমি, রীতিমত নীলাম দ্বারা তাহা আদায় করিয়া দেওয়া যাইবে এবং বাকী পড়া ভূমি দ্বারা সম্যক দাবি আদায় না হইলে, বন্দোবস্তে গ্রহীতার স্বনামী বিনামি অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক নীলাম দ্বারা বাকী রাজস্ব ইত্যাদি সরকারী প্রাপ্য আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৭) প্রতিবার বন্দোবস্তের ম্যাদ অতীতে পুনর্বন্দোবস্ত সময়ে চৌহদ্দির

অন্তর্গত ভূমি বন্দোবস্ত গ্রহীতার ব্যয়ে জরিপ করান হইবে। সরকারের প্রয়োজনে সরকারী ব্যয়ে বন্দোবস্তের ম্যাদ মধ্যেও জরিপ হইতে পারিবে। জরিপে চৌহদ্দি মধ্যে জমির পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে নির্দ্ধারিত নিয়েমে তদনুসারে জমা হ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে এবং বৃদ্ধি ভূমির নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হারে (এক বৎসরের জমা পরিমাণ) নজর প্রদান করিতে হইবে।

(৮) বন্দোবস্তের অন্তর্গত চৌহদ্দির বাহিরে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রচলিত নলে জরিপ তদন্তমূলে খাসের ভূমি বন্দোবস্ত—গ্রহীতার দখলে থাকা সাব্যস্ত হইলে, ঐ অতিরিক্ত দখলীর ভূমি দখলকালের ওয়াশীলাতসহ খাস দখলে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য থাকিবে।

(৯) বন্দোবস্তকৃত ভূমির সীমানা সরহদ্দ বহাল রাখিতে এবং সরকারের যখন যে কাগজ তলব ও দাখিল করিতে আদেশ হয়, তাহা নিরাপত্তিতে উপযুক্ত সময়ে দাখিল ও তামিল করিতে বন্দোবস্ত গ্রহীতা বাধ্য থাকিবে।

(১০) চুরি, ডাকাইতি, খুন, ইত্যাদি পুলিশ ধর্ত্তব্য কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইলে, প্রচলিত আইনমতে পুলিশে ও ফৌজদারী আদালতে এত্তলা দেওয়া বন্দোবস্ত গ্রহীতার কর্ত্তব্য হইবে। এতৎ সম্বন্ধে ত্রুটি বা শৈথিল্য করিলে তজ্জন্য জওয়াবদেহি হইতে হইবে।

(১১) বন্দোবস্ত গ্রহীতা বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থানে এমারত প্রস্তুত এবং স্থানের উন্নতিকল্পে খনন ভরট করিতে পারিবে।

(১২) বন্দোবস্তকৃত ভূমির ফৌত, ফেরার, খরচ, পতিত, লাভ, লোকসান বন্দোবস্তকারীর জেম্বা, সরকারের সহিত তদ্বিষয়ে কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না।

(১৩) রাজস্ব বিভাগ কিম্বা তাহার স্থলবর্ত্তী অফিসের লিখিত অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত বন্দোবস্তের ভূমি বা তাহার কোন অংশ দান, বিক্রয়, বা অন্য প্রকারের হস্তান্তর করিতে, অথবা চা-বাগানের অংশী স্বরূপ কাহাকেও গ্রহণ করিতে, অথবা চা-বাগান প্রস্তুত জন্য বন্দোবস্তী ভূমি বা তাহার কোন অংশের বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইতে পারিবে না।

(১৪) বন্দোবস্ত মঞ্জুরের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে চা-বাগানের কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। তাহা না করিলে বন্দোবস্ত রহিতক্রমে ভূমি অন্যত্র পত্তন করা যাইতে পারিবে। এরূপস্থলে নজর বাবত দাখিলী টাকা জব্দ হইবে।

(১৫) প্রধানতঃ চা-বাগান প্রস্তুতের নিমিত্ত ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া

হইবে। ন্যূনকল্পে এক চতুর্থাংশ পরিমাণ ভূমিতে চা-রোপণ করিয়া, অবশিষ্ট ভূমির কোন কোন অংশের অন্য শস্য উৎপাদন সম্বন্ধে সরকার হইতে আপত্তি করা হইবে না। বন্দোবস্তের প্রথম সন হইতে চা-বাগানের কার্য্যে নিয়োজিত রেজিষ্ট্রীভুক্ত প্রত্যেক কুলীর নিমিত্ত এক কানি পরিমাণ ভূমিতে ধান্য উৎপাদন করা যাইতে পারিবে।

(১৬) বন্দোবস্তের অন্তর্গত ভূমিতে খনিজ পদার্থ, প্রোথিতধন, বা প্রাচীন কীর্ত্তি থাকিলে, তাহাতে সর্ব্বোতভাবে সরকারের অধিকার থাকিবে। বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থানের বলিয়া তৎপ্রতি বন্দোবস্ত গ্রহীতা দাবি করিতে পারিবে না।

(১৭) বনবিভাগের বৃক্ষাদি কর্ত্তন ও রপ্তানী বিষয়ক ১৩২৩ সনের নিয়মাবলী অনুসারে যে ৩১ জাতীয় বৃক্ষ বর্ত্তমান সময়ে নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত আছে এবং ভবিষ্যতে যাহা নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। বন্দোবস্তের অন্তর্গত স্থানে তজ্জাতীয় কোন বৃক্ষ থাকিলে সংসৃষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের লিখিত অনুমতি গ্রহণ এবং নির্দ্ধারিত মূল্য ও শুল্ক প্রদান ব্যতীত ঐ সকল বৃক্ষ বন্দোবস্ত গ্রহীতা স্বতঃ পরতঃ ছেদন, বিক্রয় কিম্বা ব্যবহার করিতে পারিবে না। বা—বৃক্ষে ছায়া প্রদান জন্য এতজ্জাতীয় কোন বৃক্ষ উৎপাদন বা তাহা কর্ত্তন ও রপ্তানী করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। বিনানুমতিতে কোনও নিষিদ্ধ জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করা যাইতে পারিবে না। অন্য বনজ বস্তু সম্বন্ধে প্রচলিত রীতি ও নিয়ম পালন করিতে বন্দোবস্তকারী বাধ্য থাকিবে।

প্রত্যেক নির্দিষ্ট ব্লক মধ্যে যত নিষিদ্ধ বৃক্ষ পতিত হইবে। আবাদ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মূল্য ও শুল্ক (valuation and Duty) দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ব্লকের ভূমি আবাদ হওয়ার পর অন্য ব্লকস্থিত ভূমি আবাদ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ক্রমে উক্তরূপ টাকা দাখিল করিতে বন্দোবস্তকারী বাধ্য থাকিবে।

(১৮) সরকারের এবং সাধারণের ব্যবহারার্থ বন্দোবস্তকৃত সমগ্র ভূমির উত্তর হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত একটি গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নির্ম্মাণের স্থান বিনা ক্ষতিপূরণে ছাড়িয়া দিতে বন্দোবস্তকারী বাধ্য থাকিবে। এই স্থানের পরিমাণ বন্দোবস্ত প্রদানকালে সাব্যস্ত করা যাইবে।

(২

চা বাগান ও তদন্তৰ্গত ভূমি সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে এবং ভবিষ্যতে যে সকল আইন বা নিয়ম প্রচলন হইবে, বন্দোবস্তগ্রহীতা ও তাহার স্থলবর্ত্তীগণ তাহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

শ্রী কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
সেবেস্তাদার

শ্রী বিজয় কুমার সেন
দেওয়ান

(সূত্র—শ্রীদ্বিজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ও শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত—"রাজগী ত্রিপুরার সরকারী বাংলা"—পৃষ্ঠা— ৩০৫-৩০৮)

১৩২৬ ত্রিং সন থেকে ১৩৪০ ত্রিং সন পর্য্যন্ত ১৪ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে মোট ৫০টি বাগান সৃষ্টি হয়েছিল। এবং এই ৫০টি বাগানের মোট ৮,৩৮৬ একর ভূমি চা-এর গাছ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিল। (সূত্র ১৩৪০ ত্রিং সনের ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সাস বিবরনী। পৃষ্ঠা-১১৪)

বাগিচা শিল্প গড়ার প্রাথমিক স্তরে জমি সংগ্রহ হলেও চা-শিল্পের জন্য উপযুক্ত শ্রমিক ত্রিপুরায় ছিল না। ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এই সমস্ত বাগান মালিকরা আড়কাঠির মাধ্যমে নানা প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করে নিয়ে আসত।

ত্রিপুরার বাগিচা শিল্পের গোড়াপত্তনের ইতিহাসেও আছে অনেক ঘাম—অনেক অশ্রু অনেক বেদনার ইতিহাস।

চা-বাগিচা গড়ার দিকে কিভাবে শ্রমিক সংগ্রহ করা হত। তাদের কত মজুরী ধার্য্য ছিল তাদের বাসস্থান, আহার, বিশ্রাম ইত্যাদি সম্পর্কে শ্রী শক্তি প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য তাহার—"ত্রিপুরা চা-শ্রমিক প্রসঙ্গে" প্রবন্ধে (জ্বালা পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৯৭৩ইং) যে তথ্য বহুল বিবরন দিয়েছেন তার কিছু অংশ তুলে ধরছি

"ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী বনিক গোষ্ঠী ভারতীয় কিছু নাগরিকের সহায়তায় রাচী, বিহার, ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজনদের প্রথমতঃ প্রলোভন, দ্বিতীয়ত বল পূর্ব্বক এই ত্রিপুরা রাজ্যে এনে চা-বাগান গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত করে। মুণ্ডা, ওরাং, তন্তুবায়, কেবট, ভৌমিজ, রোয়াজ প্রভৃতি উপজাতির গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে দারুন অনটন ও

অভাব লেগেই থাকত। ব্রিটিশ মনিব নিয়োজিত (আড়কাঠি) দালাল গণ এই অভাব জর্জরিত লোকদের বলত—"তোমাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে—যেখানে চা-নামক এক প্রকার গাছ লাগাবে এবং সেই গাছের গোড়া ধরে নাড়া দিলে টাকা ঝরে পড়বে। সহস্র সহস্র অজ্ঞ নিরক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে এই ভাবেই ত্রিপুরার হিংস্র জীব জন্তু শ্বাপদ সঙ্কুল পাহাড়ে পাহাড়ে কার্য্যত বন্দী অবস্থায় জড়ো করা হয়েছিল"। কার্য্যত এরাই ছিল ত্রিপুরার আদি চা শ্রমিক।

"দৈনিক কম করেও চৌদ্দ ঘণ্টা বিনা পারিশ্রমিকে তাদের দিয়ে অমানুষিক ভাবে খাটানো হত। মনিবের বা মনিব নিয়োজিত ম্যানেজারের কথাই ছিল আইন। প্রাচীর বিহীন জেল খানায় তাদের আটক রাখা হত। বাজারে যেতে গেলেও শ্রমিকদের পাহাড়ায় বন্দুকধারী চৌকিদার থাকতো। মনিবের আদেশ কি তা না বুঝেও কোন শ্রমিক যদি আদেশ পালনে সামান্যতম ত্রুটি করত তবে তাকে সারা দিন গাছের সাথে বেঁধে অমানুষিক ভাবে পেটানো হত"—আবাদে—"পুরুষ শ্রমিকদের ডাকা হত "মরদানা" বলে আর মেয়েদের "রেন্ডী" বলে। তাদের প্রতি "তুই" "রে" এই ধরণের সম্বোধন করে মালিকগণ পশুকুলের উপর স্থান দিয়ে তাদের ধন্য করত। ১০/১২ জনের এক একটি পরিবারের বাসস্থান ও গৃহস্থালী জিনিষ পত্র ছিল নিম্নরূপ—১টি খড়ের ঘর, মাটির নির্মিত থালা বাসন এবং নারিকেলের ২ একটি খোল (থাচি)।" আর মজুরী ছিল—দৈনিক দশ পয়সা মাত্র। রেজিষ্ট্রিকৃত কুলির বরাদ্ধ রেশন বাবদ যে সমস্ত খাদ্য বস্তু দেওয়া হত সেটুকুও মানুষ্যত দূরের কথা পশুদের ও খাওয়ার যোগ্য ছিলনা। অথচ এর বাবদ সামান্য মজুরী থেকে কিছু অংশ কেটে রাখা হত।

পাশা পাশি সামন্ত সরকার কর্ত্তৃক নিদ্ধারিত মজুরীর হার ছিল—পুরুষ শ্রমিক— চার আনা, স্ত্রী শ্রমিক — তিন আনা)

অপর দিকে ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা সংকলিত—১৩৪০ ত্রিং সনের ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সাস বিবরণীর ১১৫ এবং ১১৬ পৃষ্ঠা পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায়—এই স্বল্প মজুরী লব্ধ শ্রমিকের নামে রক্তের বিনিময়ে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ ফসল বিদেশের বাজারে বিক্রয় করে—যে টাকা আমদানী হল তাতে সেই সমস্ত "স্বদেশী" পুঁজিপতিদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল।

এখানে আমি সেই বিবরণী থেকে দুই বছরের হিসাব সুধী পাঠকের অনুধাবনের জন্য তুলে ধরলাম।

বৎসর	মোট উৎপাদিত চা	মোট রপ্তানীকৃত চা	রপ্তানীকৃত চায়ের মূল্য বাবদ আমদানী কৃত টাকা
১৯২৯ ইং	১৪,০ ২৭ ২৫ পাউণ্ড	১৭, ১১০ মন	৬, ৮৪, ৪০০ টাকা
১৯৩০ ইং	১২, ৪৯ ৩৭৪ পাউণ্ড	১৫, ৩১০ মন	৪, ৫৯, ৩০০ টাকা
মোট	২৬ ৫২ ২০ ৯৯ পাউণ্ড	৩২ ৪২৪ মন	১১, ৪৩ ৭০০ টাকা

এই দুই বছরে বাগান গুলিতে কর্ম্মরত মোট শ্রমক ছিল ৫৪৫১ জন এবং তাদের মজুরী বাবদ বাৎসরিক ব্যয় ছিল অনুমানিক ৩০, ৬০০০ টাকা।

সুধী পাঠক উপরের এই ছোট হিসাবটুকু থেকেই অনুধাবন করতে পারবেন ঐ সমস্ত স্বদেশী মালিকদের শ্রমিক শোষন কোন পর্য্যায়ে নিয়ে পৌছে ছিল।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরার মনুষ্য বাস-অনুপযোগী এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম অঞ্চলে এই সমস্ত চা-বাগান গুলির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাথমিক অবস্থায় এই বাগানগুলিতে যে শ্রমিকরা কাজ-করত—তাদের ঘাম রক্তের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসলের বিক্রয় লব্ধ অর্থে ঐ সমস্ত "স্বদেশী"—মালিকদের পকেট যেমন দিন দিন ভারি হতে থাকল তেমনি এই শিল্প থেকে একটা অংশ শুল্ক এবং ভূমি রাজস্ব খাতে সরকারী কোষাগারে আসাতে-সামন্ত শাসকবর্গ চোখ কান বুজে সন্তুষ্ট হয়ে রইলেন। তাদের কাছে-এই সমস্ত-নবাগত-বঞ্চিত, শোষিত প্রজাদের— "বুক ভরা নিশ্বাস,আধারের বুক ফাটা চিৎকার"—পৌছল না—!

আদি যুগের সেই বহিরাগত শ্রমিরাই ত্রিপুরার মাটিতে প্রথম—চা-বাগিচা শিল্পের উদ্বোধন করেন—যাদের অধিকাংশই এদেশের মাটিতে বিনা চিকিৎসায় এবং অমানুষিক পরিশ্রমে মৃত্যু বরণ করেন—তাদের জন্য সেই সমস্ত "স্বদেশী" পুঁজিপতিরা কোন স্মৃতি ফলক বা শহীদ মিনার তৈরী করেনি—কিন্তু ত্রিপুরার পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে তাদের শোষণ, বঞ্চনা এবং অত্যাচারের কলঙ্কময় করুণ ইতিহাস জমাট বেঁধে রয়েছে—কান পাতলে আজও শোনা যায়—।

চা বাগিচা শিল্প যখন সারা ত্রিপুরায় ব্যপ্ত হতে চলেছে তখন তারই পাশা পাশি এ রাজ্যে পরিবহণ শিল্প ও গড়ে উঠতে চলেছে। প্রাথমিক অবস্থায় ত্রিপুরার পরিবহণ তথা সড়ক যোগাযোগের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ, অধুনা -বাংলাদেশের আখাউড়া রেল ষ্টেশন থেকে একটি পাকা রাস্তা আগরতলা পর্য্যন্ত এবং পরে রানীর বাজার পর্য্যন্ত। অপর রাস্তাটি কুমিল্লা থেকে সোনামুড়া এবং তথা হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তা। এই দুই রাস্তার মাধ্যমেই বহিঃ ত্রিপুরার সঙ্গে রাজ্যের মূল ব্যবসা বাণিজ্য চলত এছাড়া নদী পথেও ছোট ছোট নৌকার মাধ্যমে কিছু কিছু আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য চলত।

কোন দেশের দ্রুত শিল্পোন্নয়ণ এবং অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্ত্তনের বাহক পরিবহণ ব্যবস্থা। এই পরিবহণ শিল্প শুধু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মাল ও যাত্রীই বহণ করে না সঙ্গে সঙ্গে এক দেশ/ এক অঞ্চলের কৃষিও সংস্কৃতি অন্য দেশে অন্য অঞ্চলে বহণ করে নিয়ে যায়। এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলে। এক কথায় এই পরিবহণ শিল্প আধুনিক সভ্যতার বাহক ও ধারক উভয়-ই। অর্থনৈতিক, সামাজিক, শাসন তান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক এবং সামরিক, সকল দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে এই পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। তৎকালীন বৃটিশ সরকার সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে তার শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচা মাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য বাজার সৃষ্টির প্রযোজনে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে তাঁর শাসনতন্ত্রকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এদেশের পরিবহণ ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল, কিন্তু ত্রিপুরার তৎকালীন সামন্ত প্রভুরা ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি থেকে এই শিল্পের দিকে আদৌ কোন দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। ১৯২৩ সালে ত্রিপুরায় প্রথম পরিবহণ শিল্প গড়ে উঠে। এই শিল্প প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে আগরতলার মণি বিশ্বাস, গোপাল দেববর্ম্মা, কুমিল্লার আইরিশ সাহেব পল ডেলহনী এবং উদয়পুরের ফরিদ মিঞা অন্যতম পথিকৃত ছিলেন।

(সূত্র?Tripura in transation=Page-36) যানা যায় এই মণি বিশ্বাস চিফেন্স হত্যার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি শুধু এই শিল্প গড়ার কাজেই আত্ম নিয়োগ করলেন না পাশা পাশি এই শিল্পে কর্ম্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত করার দিকেও অগ্রসর হয়ে ছিলেন।

এই দুইটি শিল্পের পাশা পাশি ত্রিপুরায় তৃতীয় আব একটি বৃহৎ শিল্প গড়াব দিকেও পদক্ষেপ নিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই সময়ে অনেক জমিদার/তালুকদার শ্রেণীব লোকেরা জমি থেকে তাদের পুঁজি ব্যবসা এবং শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। সেই সময়ে এ রাজ্যের অকর্ষিত ভূমির প্রতি সেই সমস্ত পুঁজিপতিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই সময় সামান্য জমায এবং সহজ সত্তে এই সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠাব পযোজনীয জমি পাওযাব সহজ সুযোগ এই সমস্ত যৌগ কারবারীদের ত্রিপুরায় শিল্প প্রতিষ্ঠাব অন্যতম আর একটি কারন। ফলে চা বাগান গড়ে তোলার পাশা পাশি রাজ্য চিনি শিল্প গড়ে তোলার দিকেও তাদেব দৃষ্টি পরে। তৎকালীন সময়ে এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল ত্রিপুরার জমির অবস্থা ইক্ষু চাষের পক্ষেও অনুকূল। কৈলাশহর এবং ধর্মনগরে তখন দেশীয প্রথায় প্রচুর খাগরাই ইক্ষুর চাষও হত। এই দৃষ্টি ভঙ্গী থেকেই শ্রীহট্টের তরুন জমিদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র দাস কুমিল্লাব পাইওনিয়াব ব্যাঙ্ক থেকে ৮০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তায এবং তাঁর কতিপয় বন্ধু বান্ধবকে অংশীদার করে ১৯৩৩ খৃঃ কৈলাশহর মহকুমায় উনকোটি পাহাড়ের পাদদেশে Pioneer Sugger Mill এর অধীন— "লক্ষীছড়া সুগার ফ্যাক্টরী"—নামে ত্রিপুরার প্রথম চিনিব ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। উক্ত কোম্পানীব হেড অফিস ছিল অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট সহরে। পরের বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৪ খৃঃ কলিকাতার জনৈক প্রফেসার কুণ্ড ঐ মহকুমায় হালাইছড়া চা-বাগানেব সন্নিকটে "সরোজনী সুগার মিল"— নামে দ্বিতীয় আর একটি চিনির ফ্যাক্টরী স্থাপন করলেন। এই একই বৎসরের শেষ দিকে অথবা ১৯৩৫ খৃঃ প্রথম দিকে সদর মহকুমার বামুটিয়া অঞ্চলে সম্পূর্ণ বিদেশী পুঁজিতে জনৈক জার্মান সাহেবেব তত্বাবধানে এবং মালিকানায তৃতীয আর একটি চিনির ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয। এই চিনির কলটিই সম্ভবতঃ ত্রিপুরায় প্রথম বিদেশী মালিকানাধীন শিল্প। ত্রিপুরার প্রথম চিনিব ফ্যাক্টরীটি কি ভাবে গড়ে উঠে, তার বাৎসরিক উৎপাদন কত ছিল, শ্রমিকের মজুরীর হার কত ছিল ইত্যাদি সম্পর্কে লক্ষীছড়া সুগার ফ্যাক্টরীর তৎকালীন ম্যানেজার এবং বর্ত্তমানে নেয়ারাছড়া চা বাগানের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রামেস রঞ্জন দত্ত চৌধুরী মহাশযের এই লেখ-

কাকে লেখা একটি ব্যক্তিগত পত্র থেকে তুলে ধরছি—

"শ্রীহট্টের তরুণ জমিদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র দাস মহাশয়ের 'সহিত" ১১৩২ খৃঃ আমার প্রথম পরিচয় হয়। এই বৎসরই নভেম্বর মাসে প্রফুল্ল বাবু উনার সহপাঠি শ্রী দক্ষিণা রঞ্জন দাস সুগার এক্সপার্ট শ্রীগিরীন্দ্র- কুমার দত্ত, কৈলাশহরের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিল শ্রীদুর্গা প্রসন্ন ঘোষ (কৈলাশহরের ডাক্তার চুণী ঘোষের পিতা) এবং আমাকে নিয়া প্রস্তাবিত চিনি কারখানার জায়গা লক্ষী ছড়ার জঙ্গলে প্রবেশ করেন। কৈলাশহর টাউন হইতে ৬ মাইল পূর্ব্ব দিকে ঊনকোটি পাহাড়ের পাদ দেশে ১১৩৩ খৃঃ Pioneer sugger Mills এর মালিকানাধীন "লক্ষী ছড়া চিনি বাগান স্থাপিত হয়।" এ বছরই প্রায় ১০০ একর টীলাও সমতল ভূমির আবাদ কার্য্য শেষ করিয়া সুদূর মাদ্রাজ হইতে "মেরাং ভূটাং" জাতীয় ইক্ষুর কাটিং আনায়ন করাইযা ঐ আবাদে রোপন করা হয়।"

"সুদূর বিহার অঞ্চল থেকে ৫০-৬০ জন দক্ষ শ্রমিক প্রাথমিক অবস্থায় আনায়ন করাইযা এই Planxation এর কার্য্যে নিয়োগ করা হয়েছিল। এদের সহায়ক হিসাবে স্থানীয় গ্রামগুলির ১০০/১৫০ শ্রমিক প্রত্যহ এই আবাদে কাজ করত। ফ্যাক্টরী অঞ্চলেই এই শ্রমিকদের আবাস গৃহ তৈরী হয়েছিল। কোম্পানীর এই সমস্ত নিজস্ব শ্রমিক ছাড়াও ঠিকাদারের অধীনে এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক আবাদে কাজ করত"—চা বাগান এর জন্য যে কায়দায়-আড়কাঠির মাধ্যমে শ্রমিক সংগ্রহ হত, একই কায়দায় সুগার ফ্যাক্টরীর আবাদের শ্রমিক সংগ্রহ হয়েছিল। পরিপার্শ্বিক অবস্থায় মনে হয় এই শ্রমিকদের অবস্থাও তৎকালীন সময়ের— চা শ্রমিকদের চাইতে কোন দিক দিয়েই উন্নত ছিলনা। এই শ্রমিক-দেরও সূর্য্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত এক নাগাড়ে কাজ করতে হত। এক কথায় কাজের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় সীমা ছিলনা, এমন কি একবার কাজে ঢোকার পর আবাদ অঞ্চল ছেড়েও এই শ্রমিকদের চলে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা অথবা সুযোগ ছিলনা, প্রকারন্তরে এরা অনেকটা "দাস শ্রমিকের" মতোই ছিল—এবং মালিক নিয়োজিত কর্ম্মচারীরা এদের চাবুকের ডগায় কাজ করিয়ে নিত। এত সবের মধ্যেও চা-বাগিচা শ্রমিকদের তুলনায় চিনি-বাগান এর শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল ছিল। সর-কারী আইন মোতাবে তাদের শ্রমের ধার্য্য মূল্য অর্থাৎ মজুরীর হার ছিল—"পুরুষ শ্রমিক— চার আনা এবং স্ত্রী শ্রমিক তিন আনা। শিশু

শ্রমিকের মজুরীর কোন নির্দিষ্ট হার ছিল না।"

প্রাথমিক অবস্থায় শ্রমিকদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা আবাদ অঞ্চলে ছিলনা। এই অবস্থায় আবাদ অঞ্চলে কাজ করতে এসে সেই শ্রমিক-দের অনেকেই বিনা চিকিৎসা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে "খোদার কাছে আর্জি জানিয়ে" এই মাটিতে তার শেষ শয্যা রচনা করেছিল।

"১৯৩৪ খ্রীঃ ফ্যাক্টরী ঘর তৈরী হয়, তখন চিনি তৈরীর জন্য Boiler Engine, Sugger cane crusher Machine, centrifugal এর open Pan system এ চিনি তৈরীর জন্য তিন প্রস্থে মোট ৩৪টি furnace বসান হয়। এই সময়ে বাগান তদারকির জন্য ৬/৭ জন ষ্টাফ, এ ছাড়াও ইঞ্জিনীয়ার, মেকানিক, কারাবয়েলিং মিস্ত্রি, কেরানী ডাক্তার, দফাদার, সর্দ্দার, চৌকিদার, ডাকওয়ালা ইত্যাদি বিভিন্ন পর্য্যায়ে বেশ কিছু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাগানের নিয়মিত শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেল। এই বছরের শেষ দিক হতে ফ্যাক্টরীর উপা-দান আরম্ভ হল। প্রতিবছর গড পড়তা ১০০০ মন আখ মাড়াই ও চিনি তৈরীর কাজ চলত (ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত) প্রতি বছর গড়ে ৫০০—৬০০ মন চিনি ২০০০/২৫০০ চিনি গুড এছাড়াও যথেষ্ট পরিমাণ রাব তৈরী হইত। ১৯৩৫ খৃঃ থেকে কার-খানার উৎপাদিত চিনি, গুড ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য বাজারে ছাড়া হয়। ঐ সময়ে প্রতি মণ এই চিনির বাজার দর ছিল ১২ টাকা হইতে ১৫ টাকা। প্রতি টিন গুড সরস বারো আনা, মাঝারী—দশ আনা এবং নিরস আট আনা।

১৯৩৫ সাল থেকে "সরোজিনী সুগার মিল-" এর উৎপাদন আরম্ভ হল। এই মিল থেকে উৎপাদিত চিনির রং ছিল লাল। ফলে চিনীর পরিবর্তে ফ্যাক্টরী থেকে উৎকৃষ্ট গুড এবং রাব উৎপাদিত হল। সদরের ফ্যাক্টরীটিতে তখনও কোন উৎপাদন আরম্ভ হয়নি।

১৯৩৭ খৃঃ রাজানুকুল্যে কয়েক লক্ষ টাকার মূলধন নিয়ে "State general Electric Supply Co. Ltd" সৃষ্টি হল। প্রাথমিক অব-স্থায় এখানেও ৬০/৭০ জন শ্রমিক কর্ম্মচারী নিয়োগ হল। অনুরূপ ভাবে ১৯৩৮ খৃঃ রাজ পরিবারের কতিপয় সদস্যের মালিকানায় "মহারাজা ম্যাচ ফ্যাক্টরী" স্থাপিত হয়। এই ম্যাচ ফ্যাক্টরীর আগে বেসরকারী-মালিকানাধিন স্বদেশী শিল্পি গড়ার দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে আর একটি ম্যাচ

ফ্যাক্টরী ও ছিল। রাজ্যে এই ম্যাচ ফ্যাক্টরীর সুন্দর একটি বাজারও ছিল। ১৯৩৯ খৃঃ রাজ দরবার থেকে উক্ত "মহারাজা ম্যাচ ফ্যাক্টরীকে" দেশলাই, বাজী ইত্যাদি তৈরী, বিক্রয়, এবং রপ্তানীর এক চেটিয়া অধিকার দিয়ে এক আদেশ জারী হয়। ফলে বেসরকারী/ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ম্যাচ ফ্যাক্টরীটি তাদের কারখানা সমেত সমস্ত ব্যবসা-পত্র নবগঠিত মহারাজা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর নিকট বিক্রয় করতে বাধ্য হল। কারখানা সঙ্গে দক্ষ শ্রমিক এবং "মযোগলির" দৌলতে—মহারাজা ম্যাচ ফ্যাক্টরী স্থানীয় ভাবে লব্ধ কাঁচা মাল থেকে দেশলাই, বাজী ইত্যাদির সাথে সাথে আসন্ন জিনিষের ও Large Scale Production এবং বিপনন আরম্ভ করল। (সূত্রঃ—Tripura Dist-gazetters—K. D. Manon, page-199)

১৯৩৯ খৃঃ রাজপরিবারের কতিপয় সদস্যের মালিকনাধীন 'ত্রিপুরা সুন্দরী টকীজ" এবং "ত্রিপুরা টকীজ" নামে দু'টি সংস্থাকে মাসিক ২৫ টাকা হারে কর প্রদানের অঙ্গীকারে আগরতলা সহরে সিনেমা শো প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হল। (সূত্র—ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন)

এই শিল্পগুলির পাশাপাশি আগরতলা সহরে ভারতের অতি প্রাচীন শিল্প, বিড়ি শিল্পেরও গোড়া পত্তন হল। স্থাপিত হল—পরিবহন শিল্পের সহায়ক মোটর মেকানিকেল ওয়ার্কশপ, এছাড়াও কয়েকটি প্রেস ও স্থাপিত হল। সৃষ্টি হল মুদ্রন শিল্পেরও।

প্রাথমিক অবস্থায় এই শিল্প এবং কারখানাগুলিতে কয়েক হাজার লোকের কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। রাজদরবার তৎকালীন সময়ে এই সমস্ত শিল্প ও কারখানা মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় যতটুকু আগ্রহ ছিল তার এক আনা অংশও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় ছিলনা। এমন কি পার্শ্ববর্তী ব্রিটিশ অঞ্চলে শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় যে ন্যূনতম আইনটুকু ছিল-সেটুকুও এ রাজ্যে ছিলনা। ফলে শিল্প গড়ার পাশাপাশি মালিকের শোষণ এবং অত্যাচার যথেচ্ছ ভাবে চলত।

১৯১৬ খৃঃ থেকে ১৯৪০ খৃঃ পর্যন্ত এই সময়টুকু ত্রিপুরার শিল্পায়নের প্রাথমিক যুগ হিসাবে ধরা যায়। এ সময়ে অরণ্য ত্রিপুরা তার ঘুম ভেঙ্গে শিল্পায়নের যুগে প্রবেশ করে।

তৃতীয় পর্যায়

ত্রিপুরায় শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয় ধর্মঘট

ভারতের ধনতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থার যুগ আরম্ভ হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দী দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। তার ও আগে ভারতে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু কিছু কল কারখানা সৃষ্টি হয়েছিল। তবে প্রকৃত পক্ষে শিল্প যুগ হিসাবে ১৮৫০ খৃঃ পর থেকেই ভারতের শিল্প যুগ হিসাবে চিহ্নত করা যায়। এই সময়ে যান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থার আবিভাবের ফলে জন্ম হল শ্রমিক শ্রেণীর, তাই ভারতের শিল্প শ্রমিকের যুগের আরম্ভ ১৮৫০ খৃঃ পর থেকেই ধরা যায়। কিন্তু তারও অনেক আগে ভারতে এক বিরাট শ্রমজিবী শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। এই শ্রমজীবি শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ বাদের আঘাতে পর্যুদস্ত ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল সাধারন মানুসদের মধ্য থেকেই।

এই বিরাট অসংগঠিত মানুষদের সংগঠিত করার কাজে প্রথম এগিয়ে এলেন সমাজ সেবীরা, তাদের সমাজ হিতৈষী মূলক কাজের মধ্যে দিয়েই জন্ম নিল শ্রমিক আন্দোলনের। এই আন্দোলনের শক্তি যুগিয়েছিল ভারতের অতীতে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান গুলি। সেই অভ্যু-ত্থানের নায়কদের অনেক অধস্তন পুরুষ পরবর্ত্তী সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কলে কারখানায় শ্রমিক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। ভারতের জনগনের ইতিহাসের অনেক উপাদান এই শ্রমজিবী শ্রেণী রেখে গেছেন। তেমনি ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসেও এই শ্রমজিবী শ্রেণীর অবদান অপরিসীম।

এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৫ খৃঃ শেষের দিকে ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস এখান থেকেই যেন কথা বলে উঠল। ১৯১৭ খৃঃ কৈলাশহর মহকুমায় হীরা ছড়া চা বাগান সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরায় প্রথম চা বাগিচা শিল্পের উদ্বোধন হয়। তার ১৮ বছর পর এই মহকুমায় গোলকপুর চা বাগানে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত হয়। এই ধর্মঘটই ত্রিপুরায় প্রথম শ্রমিক ধর্ম্মঘট বলে জানা যায়। আবার এই ধর্ম্মঘটের মধ্যে দিয়েই ত্রিপুরায় শ্রমিক আন্দোলনের ও জন্ম হয়।

১৯৩৪ সালের শেষ দিক থেকে গোলকপুর চা-বাগানের মালিক তথা

পরিচালন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঐ বাগানের শ্রমিকদের মজুরী পরিশোধ নিয়ে প্রথম বিরোধ বাধে। সেই সময় বাগান মালিকদের অধিকাংশই শ্রমিকদের অর্জিত মজুরী কখনও সঠিক সময়ে এক কালীন পরিশোধ করতেন না তখনকার সময়ে বাগান মালিকদের শ্রমিকের মজুরী পরিশোধের এটাই ছিল কনভেনশন। এই বাগান মালিকদের চরিত্র সম্পর্কে তৎকালীন কৈলাশহর বিভাগের কালেক্টর প্রয়াত-ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন কল্পে তাঁর কৈলাসহর বিবরনীর ১ম পৃষ্ঠায় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সেখান থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি-

"এই বিভাগে অনেক গুলি চা-কোম্পানী খোলা হইয়াছে। সততার সহিত কার্য্য সম্পন্ন করিলে এই সকল কোম্পানীর দ্বারা স্থানীয় বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। লিমিটেড কোম্পানীর মূলধন অংশীদারগণ হইতে সংগ্রহ হইতেছে বটে-কিন্তু কোন কোন স্থলে ডিরেক্টারগণ নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যে রূপ 'সদুপায় অবলম্বন করিয়া থাকে তদ্বারা কলঙ্কের কারন উপজাত হইয়া থাকে। এই সকল কোম্পানীর পরিচালন সম্পর্কে রাজ্য সরকারের বিশেষ দৃষ্টি ও উপযুক্ত বিধি ব্যবস্থাদি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়"। এই হুসিয়ারী সত্বেও রাজ্য সরকার থেকে কোন রকম বিধি ব্যবস্থা তখন পর্য্যন্ত গৃহীত হযনি, ফলে আন্দোলন যখন চলতে থাকে তখন ১৯৩৫ সালের শেষ দিকে বাগানের এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় জনৈক শ্রমিকের 'অ-স্বাভাবিক" মৃত্যু হয। জনশ্রুতি বাগানের মালিক পক্ষের পরোক্ষ সহাযতায় এই শ্রমিকটির মৃত্যু হযেছিল। বাগানের শ্রমিকরা এই মৃত্যুর জন্য বাগান মালিকদেরই সম্পূর্ণ দায়ী করল। সেই সময় এই বাগানের ম্যানেজার ছিলেন প্রযাত ভবনী কান্ত দাস। আমি যে সময়ের কথা এখানে উল্লেখ করছি তখন কার সময়ে এই-চা-বাগান মালিকরা চাবুকের জোরে শ্রমিকদের দিয়ে বাগানে কাজ করাতেন। তাতে এমন দু'একটি শ্রমিক মারা গেলে মালিকদের কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হতনা। অনুরূপ ভাবে শ্রমিকরাও এটাই তাদের ভবিতব্য বলে ধরে নিত। ফলে কোন প্রতিবাদ ও করত না। এই নিস্পৃহতার মূল কারন, শ্রমিকরা ছিল অসংগঠিত। এবং কোন রকম শ্রমিক সংগঠন ও গড়ে উঠেনি। এমন কি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সামন্ত সরকার কোন রকম আইন কানুন বা দপ্তরেরও সৃষ্টি করেন নি। এমন কি-১৪২৭ত্রিং (১৯১৭ইং) সনে তৎকালীন রাজ্য সরকার চা বাগান গঠনের যে নিয়মা-

বলী, ও সর্ব্ব প্রচলন করেছিলেন-(পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে এই আইনের পূর্ণ বয়ান দেওয়া হয়েছে) সেই আইনের কোথাও শ্রমিকের মজুরী ঠিক সময়ে ঠিক ভাবে দেওয়ার কোন সর্ত্ত ছিলনা। তবে আইনের ১০নং ধারায় উল্লেখ ছিল "ডাকাইতি খুন ইত্যাদি পুলিস ধর্ত্তব্য কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হইলে প্রচলিত আইন মতে পুলিশ ও ফৌজদারী আদালতে এত্তলা দেওয়া বন্দোবস্ত গ্রহীতার কর্ত্তব্য হইবে'—এই ক্ষেত্রে বাগান কর্ত্তৃপক্ষ এই শ্রমিকটির মৃত্যুরকোন এত্তলা দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেননা। অথচ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে-এই সমস্ত চা-কররা কোন বেপরোয়া শ্রমিককে সায়েস্তা করতে-আইনের এই ধারাটির সাহায্য নিয়ে ঐ শ্রমিকটিকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিতেন। হাল আমলেও ধর্ম্মঘট ভাঙ্গতে মালিক পক্ষ এই কায়দাই গ্রহন করেন। তৎকালীন সময়ে যাদের উপর আইন শৃঙ্খলা এবং বিচারের ভার অর্পন করা ছিল তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই চা-কর দের পক্ষ অবলম্বন করতেন। ফলে এই চা-করদের অত্যাচারের কোন সুবিচার এই সমস্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারিদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

এই অবস্থার মধ্যে ১৯৩৫ সালে কোন পরিস্থিতিতে এবং বিনা সংগঠনে এক দল অসংগঠিত শ্রমিক ধর্ম্মঘট পর্য্যন্ত করেছিল তার পর্যালোচনায় তৎকালিন সময়ে সীমান্তের অপর পারের বাগান গুলির শ্রমিকদের অবস্থা এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা আলোচনায় আসছি।

১৯২০ খৃঃ গান্ধীজীর আহ্বানে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়, এদিকে মহাম্মদ আলী, শওকত আলীর নেতৃত্বে খিলাফত আন্দোলন ও আরম্ভ হয়। ১৯১১ খৃঃ প্রয়াত আশরাফ উদ্দিন চৌধুরীকে সভাপতি করে কুমিল্লা সহরে খিলাফত কমিটি ও গঠন করা হয়।

এ বছরই মার্চ মাসে কংগ্রেসের প্রচার কার্য্যের জন্য দেশবন্ধু কুমিল্লায় এলেন (সূত্র- স্বাধীনতা সংগ্রাম— শ্রী অখিল নন্দী- (শাশ্বত ত্রিপুরা) পৃষ্ঠা—৫০/৫১) সন্ত্রাস মূলক আন্দোলনের মত কংগ্রেসের অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনের ঢেউ ও ত্রিপুরায় এসে ধাক্কা দিল। আন্দোলন আগরতলা-থেকে বিলোনীয়া, কৈলাশহর, ধর্ম্মনগর প্রভৃতি মহকুমাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যপক ধরপাকড় ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে পরবর্ত্তী স্তরে আগরতলা, বিলোনীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যদিও আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। কৈলাশহরের গঙ্গানগর, মুকতইল, মানিকভাণ্ডার

ইত্যাদি মৌজা গুলিতে খিলাফত আন্দোলনের ব্যাপক প্রচারধর্মী জন সভা আরম্ভ হল। জুন মাসের ১১ তারিখ তৎকালীন পলিটিকেল এজেন্ট রাজা মন্ত্রীকে রাজ্য অভ্যন্তরে এই আন্দোলন সম্পর্কে হুসিয়ারী দিয়ে এবং চা-বাগান এলাকার সাত মাইল এলাকার মধ্যে এই আন্দোলন মিছিল, মিটিং বন্ধ করার কার্য্যকরী আদেশ জারি করার অনুরোধ জানিয়ে এক পত্র দিলেন।

(সূত্র—Tripura Through the Age—Dr Nalini Ranjan Roy Chowdhury Page 71)

অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনের সময় সুরব অঞ্চলে যে সমস্ত সভা সমিতি এবং শোভা যাত্রা হয় তার খবর পৌঁছে যায় সীমান্ত সংলগ্ন শ্রীহট্টের চা বাগান গুলিতেও। ইংরাজ মালিকদের অমানুষিক অত্যাচারে জর্জরিত বাগানের কুলিরা গান্ধীজীর বাণীতে তাদের মুক্তির ইঙ্গিত পেল। ফলে এইসব অঞ্চলের বাগান গুলিতে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম ও ধর্ম্মঘট আরম্ভ হল। তৎকালীন ইংরেজী সরকার এই ধর্ম্মঘট মোকাবিলায় সমস্ত রকম দমন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই সময়ে এই ধর্ম্মঘট এবং নিষ্পেষনের মধ্য থেকেই এই অঞ্চলে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম হয়, অপর দিকে এই ধর্ম্মঘট গুলিই তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টিকে সুরমা ভেলী চা শ্রমিকদের জোড়ালো নেতৃত্ব দেওয়ার পথ ও সুগম করে দেয়। (সূত্র CPIM—Promises Prospects Problems—Bhabani Sen gtupta Page 171) সৃষ্টি হয় – 'সুরমা-ভেলী চা-শ্রমিক ইউনিয়ন"—এর, পররর্ত্তী সময়ে ১৯৪৫ খৃঃ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর নেতৃত্বাধীন-শ্রীহট্ট জেলা চা-শ্রমিক ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। সংগঠন যদিও কংগ্রেসীদের দ্বারা পরিচালিত ছিল, সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে কমিউনিষ্টদের প্রভাব তখনও যথেষ্ট পরিমাণ ছিল। (সূত্র—পূর্ব্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায় —বদউরুদ্দিন উমর পৃঃ ৭৯)

চা-শ্রমিকদের মধ্যে আসাম ও কাছাড়ের শ্রমিকরা ছিল সব চেয়ে বেশী নিষ্পোষিত-ফলে গান্ধীজীর বাণী এইসব অঞ্চলের চা শ্রমিকদেরও ভীষণ ভাবে নাড়া দিল। এমন সময় কে যেন রটিয়ে দিল গান্ধীজী চা শ্রমিকদের ইংরেজী বাগান মালিকের দাসত্ব বন্ধন ছিন্ন করে দেশে ফিরে যেতে আহ্বান রেখেছেন। ফলে ১৯২১ সালের মে মাসে আসাম ও কাছাড়

জেলার চা-শ্রমিকরা পায়ে হেটে ট্রেন ধরার আশায় করিমগঞ্জে এসে জড়ো হল। কিন্তু তাদের ট্রেনেও উঠতে দেওয়া হলনা, পরবর্ত্তী সময় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের হস্তক্ষেপে যদিও তারা ট্রেনে উঠল কিন্তু মাঝ পথে বাগান মালিকদের প্ররোচনায় ব্রিটিশ পুলিশ জোর করে অনেক শ্রমিককেই নামিয়ে দিল।

এই মাঝ পথে নেমে পরা শ্রমিকদের বেশ কিছু অংশ এবং শ্রীহট্টের ধর্ম্মঘটি শ্রমিকদের এক অংশ বৃটিশ সরকারের নিষ্পেষনে পালিয়ে এসে সীমান্ত সংলগ্ন কৈলাশহর ধর্ম্মনগর-এর চা-বাগান গুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ত্রিপুরার বাগান মালিকেরাও দেখলেন, সুলভে একদল দক্ষ শ্রমিক পেয়ে যাচ্ছেন তখন ব্রিটিশ সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও এই শ্রমিকদের তাদের বাগানের কাজে নিয়োগ করলেন। সেই সময় এখানকার প্লেন্টার্সরা তাদের আড কাঠির মাধ্যমে পার্শ্ববর্ত্তী ব্রিটিশ এলাকাধীন বাগানের শ্রমিকদের অনেক লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসতেন।

এই বহিরাগত শ্রমিকদের অনেকেই যেমন তৎকালীন সময়ে সংগঠিত চা-শ্রমিক ধর্ম্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিল তেমনি অনেকেই অসহযোগ, খিলাফত আন্দোলন, শ্রমিক কৃষক বিশেষত আসাম বেঙ্গল রেল ধর্ম্মঘটও প্রত্যক্ষ করেছিল। ফলে তাদের চেতনায় শ্রমিক আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ার প্রবনতা পুরোপুরি ছিল। অন্যদিকে সেই সময়ে ব্রিটিশ পুলিশের তাড়া খেয়ে পূর্ব্ববাংলার অনেক বিপ্লবী এখানকার চা বাগান গুলিতে চা শ্রমিকদের মাঝে এসে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তাঁরা এই শ্রমিকদের সংগঠিত করতে না পারলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অনুপ্রেরনা জুগিয়েছিলেন।

এই অবস্থায় গোলকপুর চা-বাগানের শ্রমিকেরা বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে সেই হতভাগ্য শ্রমিকটির মৃত্যুর বিচার চাইল। বিচারের আবেদন রাখল সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছেও। পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি মহকুমা কর্তৃপক্ষের হাতে এই সমস্ত মারপিটের ঘটনা গুলির মিমাংসার ভার ছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাঁরা নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করলেন। ফলে বাগানে বাগানে ধর্ম্মঘটের আগুন জ্বলে উঠল। বেশ কয়েক দিন ধর্ম্মঘট চলার পর যখন দেখা গেল এই ধর্ম্মঘট ভাঙ্গা যাচ্ছে না বরং উত্তরোত্তর তার তীব্রতা বৃদ্ধিপাচ্ছে তখন সরকারী কর্তৃপক্ষ মালিকের পক্ষ নিয়ে এই ধর্ম্মঘট ভাঙতে এগিয়ে

এলেন। এভাবেই বাগান মালিকের প্ররোচনায শাসন কর্তৃপক্ষের নিষ্পেষনে গোলকপুর চা-শ্রমিকদের তথা স্বাধীন ত্রিপুরার প্রথম শ্রমিক ধর্ম্মঘটের অবসান হয়। এই ধর্ম্মঘট যদিও শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি অথবা কাজের সময় সীমা নির্দ্ধারন করার কোন দাবী ছিল না— কিন্তু এই ধর্ম্মঘটের মধ্য দিয়েই ত্রিপুরার চা-শ্রমিক প্রথম সংঘবদ্ধ হওয়ার দিকে এগিয়ে গেল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস অর্জন করল। প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে উল্লেখ করছি—প্রযাত ত্রিপুর চন্দ্র সেন তাহার "Tripura in Transation"—বইএর ২৬/২৭ পৃষ্ঠায় ত্রিপুরার প্রথম শ্রমিক ধর্ম্মঘট হিসাবে ১৯৩৮-৩৯ খৃঃ সংগঠিত আগরতলা সহরের "পৌর ধাঙর" ধর্ম্মঘটকে উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই "ধাঙর ধর্ম্মঘট" ছিল তৃতীয় ধর্ম্মঘট। পরবর্ত্তী অধ্যাযে এ সম্পর্কে আলোচনায় আসছি।

গোলকপুর চা-বাগানের সেই অসংগঠিত শ্রমিকরা যে কায়দায় সেদিন তাদের আন্দোলন পরিচালনা করেছিল ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে তা ছিল এক নূতন শিক্ষা—সেদিনের সেই সংগ্রামী শ্রমিকরা তাদের সংগ্রাম থেকে কিছু না পেলেও আগামী দিনের জন্য তাদের সংগ্রামের মাধ্যমে রেখে গেল প্রেরনা, এবং শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কৌশল ও নীতি।

গোলকপুর চা বাগানের ধর্ম্মঘট মিটতে না মিটতেই ১৯৭৭ খৃঃ কৈলাশহর বিভাগের লক্ষীছড়া সুগার ফ্যাক্টরীতে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হল, এই ধর্ম্মঘট ছিল রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণীর দ্বিতীয় ধর্ম্মঘট।

ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই ধর্ম্মঘট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদিও অল্প কিছুদিন আগে গোলকপুর চা-বাগানে ধর্ম্মঘট হয়েছে তবু চেতনা এবং সাংগঠনিক দিক থেকে, শ্রমিক শ্রেণী,,—শ্রেণী হিসাবে তখনও আত্মপ্রকাশ করেনি। তখন আবাদে স্থাযী শ্রমিক সংখ্যাও বেশী ছিলনা। অধিকাংশই ছিল ঠিকাদারী প্রথায়। বেতন এবং হাজিরার দিক থেকেও এরা সংঘবদ্ধ ছিলনা।

১৯৩৪ খৃঃ থেকে ফ্যাক্টরীতে উৎপাদন আরম্ভ হল, প্রথম কয়েক বছর ফ্যাক্টরীতে ভাল উৎপাদন হয়েছিল এবং উৎপাদিত চিনি বাজারে বিক্রয় করে কোম্পানীর ভাল আয় ও হয়েছিল। ১৯৩৭ খৃঃ প্রথম দিক থেকে কোম্পানীতে মজুরী ইত্যাদি নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষ আরম্ভ

হল। এখানেও শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির চেয়েও ঠিক সময় পুরো মজুরী পাওয়ার দাবীই ছিল মুখ্য। পরবর্ত্তী সময় এর সঙ্গে এসে যোগ দিল মজুরী বৃদ্ধি। কাজের সময় নির্দ্ধারন ইত্যাদি। এই সময় চা-বাগানের রেজেষ্ট্রি বর্হিভূত অনেক শ্রমিককে "চিনি বাগানে" Casual laboour হিসাবে কাজে নেওয়া হয়েছে। বাগানের স্থায়ী শ্রমিকদের এই ব্যবস্থা সম্পর্কে আপত্তিও ছিল। এই সমস্ত ছোট খাট ঘটনার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক-দের অসন্তোষের বহিঃ প্রকাশ ঘটতে আরম্ভ হল। এই সময় থেকে Management এর সঙ্গে শ্রমিকদের সম্পর্কও খারাপের দিকে চ'লো। এদিকে মালিক পক্ষের বক্তব্যছিল সুষ্ঠু পরিবহনের অভাবে উৎপাদিত চিনি, গুড, আভ্যন্তরীন বাজার অথবা বহিঃ ত্রিপুরার বাজারগুলিতে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা ছিলনা। এদিকে বিশ্বযুদ্ধের দামামাও বেজে উঠেছে ফলে চিনির দাম ও হ্রাস পাচ্ছে। এই অবস্থায় স্থানীয় বাজার গুলিতে উৎপাদিত চিনি এবং গুড়ু বিক্রয় করে শ্রমিকের মজুরীর এক তৃতীয়াংশও পরিশোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। এদিকে বাজারে কোম্পানীর দেনাও দিন দিন বেড়েই চলছে। এই অবস্থায় মালিক পক্ষ শ্রমিকদের দাবীর কোন যৌক্তিকতাই স্বীকার করতে চাইলেন না। এদিকে যেই সময় গডা এবং প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে আবাদের ও প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। দেনার দায়ে কোম্পানীকে তখন অন্য আর একটি কোম্পানির কাছে বন্ধক রাখতে হয়েছে। এদিকে শ্রমিকরা পর পর বেশ কিছুদিন তাদের প্রাপ্য মজুরী থেকে বঞ্চিত। ফলে শ্রমিক বস্তিতে আরম্ভ হল অর্ধাহার, অনাহার। এই অবস্থায় আরম্ভ হল ধর্ম্মঘট, ধর্ম্মঘট চলাকালে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হল যখন দীর্ঘ দিন মজুরী থেকে বঞ্চিত, ক্ষুধার্ত শ্রমিক কারখানার অভ্যন্তরে এক অভ্যুত্থান ঘটাল। উৎপাদন যন্ত্রকেই তাদের প্রধান শত্রু চিহ্নিত করে কারখানার "কলঘর" এ (Machineroom) আগুন ধরিয়ে দিল। এই অবস্থায় মালিক পক্ষ সরকারী প্রশাসন এবং পুলিশের সহায়-তায় এই ক্ষুধার্ত এবং বিদ্রোহী শ্রমিকদের মোকাবিলায় এগিয়ে এল। এক্ষেত্রেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা নিলেও পরবর্ত্তী সময় বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে এই নিরস্ত্র ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের উপর ঝাপিয়ে পরে "বিদ্রোহ"-কে ঠাণ্ডা করে দেয়। তৎকালীন রাজকীয় পুলিশ বাহিনী এই ধর্ম্মঘট ঠাণ্ডা করতে গিয়ে কত জন শ্রমিককে পরপারে পাঠিয়েছিল তার কোন সঠিক হিসাব রেখে যায়নি,

কিন্তু ইতিহাস তাদের ভুলেনি। কবি সুকান্তের কথায় বলা যায়—

"মুক্তির প্রচ্ছদ পটে ওদের কাহিনী আজ ঢাকা,
আগন্তুক ইতিহাসে ওরা আজ প্রথম অধ্যায়;"

এই ঘটনার পর কারখানার দরজা কিন্তু আর খুলেনি। কিছুদিন পর কারখানার সমস্ত দরজা জানালা এবং অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি দেনার দায়ে পাওনাদারদের হস্তগত হয়। ১৯৪০ খৃঃ শেষ দিকে তৎকালীন সামন্ত শাসক বকেয়া খাজনার দায়ে কোম্পানীর সমস্ত ভূসম্পত্তি হঠাৎ করে নীলাম ডাকেন, এবং সোনামুখী চা বাগানের তৎকালীন মালিক গোপেশ চন্দ্র পাল সর্ব্বোচ্চ ডাক দিয়ে নীলাম খরিদ করে নিলেন।

স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে ত্রিপুরা সরকার এই জমির বেশ কিছু অংশ অধিগ্রহণ করে ভূমিহীন জুমিয়া পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করেন। এবং কিছু অংশে স্থানীয় পূর্ত্তদপ্তরের এস, ডি, ও অফিস তৈরী করেন। অবশিষ্ট জমি বি, এল, রায় নামে জনৈক ঠিকাদারের ইটের ভাটায় পরিণত হয়। আজও লক্ষীছড়ার সেই অঞ্চলটি ত্রিপুরার প্রথম চিনি শিল্পের নিদর্শন হিসাবে "চিনি বাগান" নামে জনগণের কাছে পরিচিত।

এই ঘটনা প্রতিফলিত হয় পার্শ্ববর্ত্তী সরোজিনী সুগার মিলেও। মালিক পক্ষ তখন কারখানা বন্ধ করে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি চা-বাগানে রূপান্তরিত করে নেয়।

এদিকে সদরের প্রতিষ্ঠিত বিদেশী মালিকানাধীন যে তৃতীয় কোম্পানিটি সৃষ্টি হয়েছিল তার ও সমস্ত ভূসম্পত্তি তৎকালীন রাজ্য সরকারের এক আদেশমূলে বকেয়া রাজস্বের দায়ে সরকারী খাসে এনে নীলাম ডাকা হয়। এই কোম্পানীতে তখন পর্য্যন্ত কোন উৎপাদন আরম্ভ হয়নি এবং কোন রকম শ্রমিক অসন্তোষ ছিল বলেও জানা যায়নি। তবে তৎকালীন সামন্ত শাসকরা চাইতেন না ত্রিপুরার অভ্যন্তরে বিদেশী এসে ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ করে বসবাস করুক। মনে হয় এই দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকেই এই কোম্পানীটি বন্ধ করা হয়েছিল।

এভাবেই ত্রিপুরার সম্ভাবনাময় দ্বিতীয় বৃহত্তর শিল্পটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

(এই অংশের তথ্যাদি পরিবেশন করে সাহায্য করেছেন ধর্ম্মনগরের শ্রীযুক্ত রামেস রঞ্জন দত্ত চৌধুরী, কৈলাশহরের ডাঃ চুণী ঘোষ এবং আগরতলার শ্রী মোহন চৌধুরী।)

৪র্থ পর্য্যায়

সংঘঠন গড়ার যুগ

পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় ইংলণ্ডেই প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম হয়। কারণ সে দেশেই প্রথম আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দী ইউরোপের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। এই শতাব্দীতেই বহুমুখী বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের ফলে শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। এটাই ছিল শিল্প বিপ্লব। এই শিল্প বিপ্লবের সূচনা ইংলণ্ডেই প্রথম ঘটেছিল। পরবর্ত্তী সময়ে ইউরোপের অপরাপর দেশেও এই শিল্প বিপ্লবের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। যান্ত্রিক শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে শ্রমিক শোষণের নিত্য নূতন ঘৃণ্যতম কায়দাও তারই পাশাপাশি আবিস্কৃত হতে থাকে। শ্রমিকরা এই শোষণ এবং নিপীড়নের কবল থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলনে নামে। ফলে ১৮৭১ খৃঃ গ্ল্যাডষ্টোন মন্ত্রী সভার আমলে ইংলণ্ডে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট চালু হয়। এই আইনের বলে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণী—মালিকের জুলুম, অত্যাচার অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং সংগঠন করার পূর্ণ অধিকার অর্জন করে। পরবর্ত্তী সময়ে বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উপর এর প্রভাব বিস্তার করে।

ভারতবর্ষে এই আইন প্রথম চালু হয় ১৯২৬ সালে। কিন্তু "স্বাধীন ত্রিপুরায়—এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের প্রথম পর্য্যন্ত এই টেড ইউনিয়ন এ্যাক্ট চালু হয়নি। ত্রিপুরার শ্রমিক আন্দোলন কিন্তু তাতে আদৌ বন্ধ হয়নি। ত্রিপুরার শ্রমিক শ্রেণী তার নিজস্ব কায়-দায—রুটি রুজির দাবী নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

সারা পৃথিবীর ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন যন্ত্রকে তার প্রধান এবং প্রথম শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে ধ্বংস পর্য্যন্ত করেছিল। ভারতীয় ট্রেড ইউনিষণ আন্দোলনের ইতিহাসে

অনুরূপ কোন ঘটনার যেমন কোন নজির নেই, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে লক্ষী-ছড়া সুগার ফ্যাক্টরীর ঘটনা ছাড়া বিপরীত ঘটনাই দেখা গেছে। ত্রিপুরার শ্রমিক তার উৎপাদন যন্ত্রকে রক্ষার জন্য মালিকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধেও লড়াই করেছে। এমন একটি ঘটনা দেখা যায় ১৯৫০ খৃঃ যখন জ্বালানী সরবরাহের বিশৃংখলা এবং তার ফলশ্রুতি পরিবহন শিল্প বন্ধ হওয়ার মুখে, তখন এই শিল্পকে রক্ষা করতে শ্রমিকরা মালিকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়াই করেছে। অনুরূপ ঘটনা বিড়ি শিল্পেও ঘটেছিল, যখন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০ খৃঃ Finance Act এ রাজ্যে প্রযোগ করে বিড়ি তৈরীর লাইসেন্স ফি ২ টাকার স্থলে এক ধাপে ৫০ টাকা করে দিলেন। ফলে ত্রিপুরার ছোট ছোট বিড়ি কারখানাগুলি বন্ধ হওয়ার পথে, এবং একই ভাবে ১৯৫৩ খৃঃ সরকারী আনুকূল্যে বহিঃ ত্রিপুরা থেকে বিড়ি আমদানী করে সস্তা দরে অভ্যন্তরীন বাজারগুলিতে ছাড়ার উপক্রম করল এবং যখন বুঝা গেল, প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ছোট ছোট কারখানাগুলি টিকতে পারবে না তখন এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা বিড়ি কারখানার মালিকদের সহযোগী করে শিল্পকে রক্ষার আন্দোলনে নামে এবং এই সস্তা দামের বিড়ি আমদানী বন্ধ করতে কৃতকার্য্য হয়। একই ঘটনা দেখা গেছে ১৯৫১ খৃঃ সংগ্রামী চা-শ্রমিকরা ত্রিপুরার জাতীয় শিল্প—চা—শিল্পকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মালিকের সাথে একযোগে আন্দোলনে নেমেছিল।

(সূত্র-ত্রিপুরার কথা—১৭/১১/৬০ ত্রিং, ২৪/১১/৬০ ত্রিং ৭/১২/৬১)। এই লক্ষ্যনীয় ব্যতিক্রমের মূলে রয়েছে ত্রিপুরায় শিল্প উদ্যোক্তাদের মাঝে যেমন স্বদেশী আন্দোলনের অনেক সক্রিয় কর্ম্মী ছিলেন তেমনি শিল্পায়ণের প্রথম থেকেই শ্রমিকদের মাঝে অনেক সমাজ সেবী এবং রাজনৈতিক কর্ম্মীও কাজ করেছিলেন। সমসাময়িক সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত অনেক সক্রিয় রাজনৈতিক কর্ম্মী ব্রিটিশ পুলিশের তাড়া খেয়ে এ রাজ্যে কৃষক শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষের মাঝে এসে আশ্রয় নিতেন। এই সমস্ত বিপ্লবীরা এখানে এসে কেউ মুদীখানার গোমস্তা, কেউবা চাষের কাজে, কেউবা চা-বাগানে চা-শ্রমিকের কাজ নিয়ে এসে এদের সাথে মিশে যেতেন। এই বিপ্লবীদের সাহচর্য থেকে শ্রমিকরা যেমন অন্যায় অবিচার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস অর্জন করল তেমনি ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলারও অনুপ্রেরনা পেল। পরবর্ত্তী

সময়ে প্রজামণ্ডল এবং জনশিক্ষা সমিতির অবদান। সমিতির কর্মীরা শ্রমিকদের মাঝে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ কল্যাণ মূলক কাজের সাথে সাথে তাদের শ্রেণী সচেতন করে তুলতে ব্রতী হলেন। এই সময় থেকেই সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের ও সংগঠন গড়ার সূত্রপাত হয়।

ভারতে সংঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম ১৮৮০ খৃঃ বোম্বাই এর সুতা কল শ্রমিকদের মাঝে। তার ও ১০ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৭০ খৃঃ বাংলাদেশে শশীপদ ব্যানার্জী 'শ্রমজীবি সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রমজীবি সমিতিই ভারতের প্রথম শ্রমিক সংঘ, (সূত্র-"ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস"—গোপাল ঘোষ) কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় সুদূর মোঘল যুগেও ভারতের শ্রমিকরা তাদের মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে একবার ধর্ম্মঘট ও করেছিল।

(সূত্র- "ভারতের ইতিহাস"—ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার)। ধর্ম্মঘট না করলেও রাজগী ত্রিপুরার সরকারী চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা ১৩২৯ ত্রিং সনে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্য বাহাদুরের রাজত্বে প্রচলিত প্রথম ভাতার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে বিক্ষোভ জানিয়েছিল। এবং তারই ফলশ্রুতি ১০/১/১৩৩০ ত্রিং তারিখে ৭২ নং আদেশ তাদের প্রথম চার আনার স্থলে ছয় আনা বৃদ্ধি করিয়েছিল। (সূত্রঃ- ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট—উনবিংশ ভাগ, প্রথম সংখ্যা- বৈশাখ, ১ম পক্ষ, ১৩৩০ ত্রিং)

অনুরূপ ভাবে খোয়াই মহকুমার পার্শ্ববর্ত্তী বৃটিশ এলাকার চা-বাগানগুলির যে সমস্ত শ্রমিক পালিয়ে এসে এ রাজ্যে ভূমি বন্দোবস্ত নিয়ে রাজ্য সরকারের প্রজা হিসাবে চাষ আবাদ আরম্ভ করেছিল—১৩২০ ত্রিং সনের সেন্সাসে ঐ সমস্ত প্রজাদের রাজ্য সরকার থেকে "কুলি" হিসাবে হিসাবে করে নথীভুক্ত করার আদেশ হয়। তখন "এই শ্রেণীর প্রজাগণ "কুলি" বলিয়া পরিচিত হইত এবং তাদের নামে রেজিষ্টারী ভুক্ত করিতে দলবদ্ধ ভাবে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিল। তন্মতে তাহাদিগকে-"কুলি" না লিখিয়া স্ব—স্ব জন্মগত পদবী অনুসারে "ওরাও" "মুণ্ডা" প্রভৃতি লিখিত হইয়াছিল।"

(সূত্র—খোয়াই বিবরণী—ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, পৃষ্ঠা-৭০ খৃঃ)। মূল প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসছি। ১৮৭০ খৃঃ বাংলা দেশে শশীপদ ব্যানার্জীর শ্রমজীবির সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রায় ৭০/৭১ বৎসর পর

ত্রিপুরা শ্রমিক সংঘ গড়ার দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তারও প্রায় ২০ বছর আগে শ্রমিকদের বিশেষত চা-শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন বাংলার বিপ্লবীদের কয়েকজন।

তৎকালীন ব্রিটিশ পুলিশের তাড়া খেয়ে বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত সক্রিয় কর্ম্মী ত্রিপুরার জঙ্গলে এসে আশ্রয় নিতেন, এখানে এসে কয়েকটি অঞ্চলকে তাঁদের আশ্রয় স্থল হিসাবে বেছে নিলেন। এমনি একটি ঘাঁটি ছিল উদয়পুরে। ১৯১২ খৃঃ অনুশীলন সমিতির কুমিল্লা শাখার-রজনী নাথ রায় গোমতীর তীরে উদয়পুর মহকুমার ধোপাইছড়ির জঙ্গলে সমিতির সভ্যগণকে অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতে একটি কৃষি খামার খোলেন। পরে দলের অপর নেতা নরেন সেন বিলোনীয়া মহকুমায় বগাফা (মতান্তরে মাইছড়া) আর একটি অনুরূপ কেন্দ্র খোলেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই কেন্দ্রের ভার দেওয়া হয় সীতানাথ দাসকে। এই সময় দলের মূল নেতৃত্বে ছিলেন, প্রয়াত সারদা চক্রবর্ত্তী এবং তাঁর সহকারী ছিলেন প্রয়াত পুলিন বিহারী গুপ্ত। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করছি, উক্ত দলনেতা সারদা চক্রবর্ত্তী দলের অনেক গোপন কথা পুলিশের কাছে প্রকাশ করেন ফলে বেশ কয়েকজন বিপ্লবী কর্মী পুলিশের হাতে ধরা-পড়েন। দল বিরোধী কাজের জন্য পরবর্ত্তী সময়ে এই সারদা চক্রবর্ত্তীকে হত্যা করা হয়।

এ সম্পর্কে ডাঃ রমেশ মজুমদারের "History of Freedom Movement in India (Vol. 11) বই এর ২৮৬ পৃষ্ঠা থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি।—"For the purpose of training its members, the Anusilan Samiti had two farms at Belonia and udaipnr in Hill Tipperah. These were out wordly, and in part really agricultural farms, but they served mainly as centres for training. During day time the members worked as laboures in the field but in night they were given training in the use of different kinds of arms and practised shooting in the neighbouring hills. They had to work hard and lived under strict military discipline."—

এই কৃষি খামার দু'টির সঙ্গে কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। জানা যায় এই ঘাঁটি দু'টির উপর সরকারী

গুন বৃষ্টি বাগার কাজে তৎকালীন সামন্ত সরকারের পুলিশ কর্মচারী প্রভাত অনাথ চৌধুরী নিযুক্ত হয়েছিলেন অনুরূপ আর একটি ঘাঁটি কৈলাশহর মহকুমার মুর্ত্তিছড়া অঞ্চলে ও নরুপ্ত মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মাধবলাল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন সিলেট জেলার অনেক বিপ্লবী কর্মীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল এই ঘাঁটির সঙ্গে। পারিপার্শ্বিক ঘটনায় মনে হয় এই ঘাঁটি গুলিতে অবস্থানরত বিপ্লবীদের সঙ্গে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের শ্রমিক কৃষকদের যোগাযোগ ঘটেছিল শ্রমিকদের মাঝে যদিও তাঁরা কোন সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন নি কিন্তু আন্দোলন গড়ে তোলার অনুপ্রেরনা দিয়ে গিয়েছিলেন।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের প্রভাব পড়ল ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে। ফলে জাতীয় আন্দোলনে এল নুতন জোয়ার। তারই কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১৯২২ খৃঃ ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা শহরে অনুশীলন দলের উদ্যোগ এবং জেলা পলাতক কতিপয় বিপ্লবীর প্রচেষ্টায় "লেবার হাউস"-নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। মুখ্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন অতীন রায়, যোগেশ চ্যাটার্জী, মনিন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পুলিন গুপ্ত, জীতেন ভট্টাচার্য্য। আর্থিক সহায়তা করেছিলেন, প্রয়াত মহেশ ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্র দত্ত, ইন্দু ভূষন দত্ত প্রমুখ। পরবর্ত্তী সময়ে এই লেবার হাউস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী, প্রমোদ চক্রবর্ত্তী, প্রবোধ চক্রবর্ত্তী, জিতেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও যোগেশ চক্রবর্ত্তী। সেই সময় এই Labour house থেকে উৎপাদিত ছোট খাট কৃসি যন্ত্রপাতি, চা-বাগানে ব্যবহার্য্য ছোট খাট যন্ত্রপাতি প্রচুর উৎপাদিত হয়েছিল এবং এইসব অঞ্চলের কৃষক-দের কাছে এই সমস্ত যন্ত্রপাতির যেমন চাহিদা ছিল, তেমনি ত্রিপুরার সদ্য গঠিত চা-বাগান গুলিতে ও এই সংস্থা তাদের উৎপাদিত যন্ত্রপাতি যোগান দিত। তৎকালীন সময়ে এই লেবার হাউস দেশলাই কলের উন্নত ডিজাইন তৈরী করে খ্যাতিলাভ করেছিল। এই লেবার হাউস সৃষ্টির ভেতরের উদ্দেশ্য যাই থাকুক বাইরে দেখানো হয়েছিল, বাঙ্গালী যুবকদের শিল্প এবং ব্যবসায় উৎসাহিত করা। অপর দিকে এই লেবার হাউস সৃষ্টির মূলে রুশ বিপ্লবের ছায়া কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছিল। সংস্থার উৎপাদিত এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত আর্থিক উপসত্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মরত কর্মীরাই ভোগ করতেন। তৎকালীন সময়ে এইসব অঞ্চলের চা-বাগান গুলিতে প্রাথমিক পর্য্যায়ে ব্যবহৃত এবং ছোট খাট যন্ত্রপাতি এই লেবার হাউস থেকেই

খোয়াজ-মেস্কৃয়া-ছত্র। এ সময়ে ঢাকা কলকাতা বাংলার প্রলিচালনা মামলায় শাস্তি প্রাপ্ত আন্দামান ফেরত বিপ্লবী (পরবর্তী সময়ে কাকরী কনস্পিরেসী মামলার আসামী) নিকুঞ্জ বিহারী পাল ত্রিপুরার পাহাড়ে এলেন (মতান্তরে লেবার হাউস এর কতিপয় উদ্যোক্তার চেষ্টায় পাঠান হয়েছিল) এখানে এসে তিনি চা-শ্রমিকদের মাঝে আশ্রয় নিয়ে বাগানের কাজে শ্রমিক হিসাবে যোগ দিলেন। সমসাময়িক সময়ে জিতেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, পরেশ চট্ট্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দত্ত পুলিন বিহারী গুপ্ত, প্রবোধ চক্রবর্ত্তী মথুর দেব প্রমুখ এক কালের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তথা অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং পরবর্ত্তী সময়ে লেবার হাউস এর সৃষ্টি কর্ত্তারা ত্রিপুরায় চা-বাগান গড়তে এলেন। অন্য দল আগরতলা শহরে স্বদেশী দেশলাই কারখানা আরম্ভ করলেন। ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় নিকুঞ্জবাবু ত্রিপুরায় এসেছিলেন চা শ্রমিকদের সংগঠিত করতে। ১৯২১ খৃঃ শেষ দিকে কাছাড় জেলার চা-শ্রমিকদের এক অভ্যুত্থান হয়। শ্রমিক আন্দোলনের চাপে পড়ে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ১৯২২ খৃঃ এক তদন্ত কমিশন বসায়;--উক্ত তদন্ত কমিশন শ্রমিকদের কাজের সময়, সর্ত্ত, ইত্যাদি নিয়ে পর্য্যালোচনা আরম্ভ করল। এই অভ্যুত্থানে ত্রিপুরার "স্বদেশী পুঁজিপতি" বাগান মালিকরা যাদের একটি অংশ এক কালে বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন তারা ভয় পেয়ে গেলেন। যদি এখানে ও অনুরূপ আন্দোলন আরম্ভ হয় (?) ফলে নিকুঞ্জ বাবুকে বাগিচা এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হল। (সূত্র-এই অংশের তথ্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী শচীন্দ্র দত্ত)। নিকুঞ্জ বাবু এবং তাঁর অনুগামীরা বাগান ছেড়ে গেলেও শ্রমিকদের মাঝে রেখে গেলেন সংগঠন গড়ার এবং আন্দোলন করার প্রবনতা। ফলে ১৯৩৬ খৃঃ সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়েও কোন রকম সংগঠন ছাড়াই গোলকপুর চা বাগানের শ্রমিকরা ত্রিপুরায় প্রথম ধর্ম্মঘট করেছিল এবং পরের বৎসর চিনি বাগানের শ্রমিকরা শ্রমিক অভ্যুত্থান পর্য্যন্ত করেছিল।

ত্রিপুরার তৎকালীন অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এখানে কিছুটা পর্য্যালোচনায় আসছি। ১৯২৭ খৃঃ মতান্তরে ১৯২৬ ছাত্র সংঘ প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৮ খৃঃ (মতান্তরে ১৯২৭) এই ছাত্র সংঘ ভেঙ্গে ভাতৃসংঘের সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান এবং প্রাক্তন অনেক মন্ত্রীই এই সংঘ দু'টির সঙ্গে তৎকালীন সময়ে যুক্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গ এখানে এই কারনে

জানছি. পরবর্তী সময়ে সংঘের সদস্যগণের অনেকেই ত্রিপুরার আকাশে কেউ বা শ্রমিক শোষন এবং নিষ্পেষনের একনিষ্ঠ সেবক রূপে আবার অনেকে এই নিষ্পেষন এবং শোষন মুক্তির অগ্রদূত হিসাবে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত বিরাজ করছেন বা করেছেন। প্রাথমিক স্তরে এই সংঘ গুটির উদ্দেশ্য শরীর চর্চা, লাঠি খেলা ছোরা খেলা, সমাজ সেবা ইত্যাদি, পরবর্তী পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রভাব—সংঘের সদস্য গণের উপর পরে-এখন অনেক সদস্য প্রত্যক্ষ ভাবে আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়েন আবার অনেকে সশস্ত্র বিপ্লবের দিকেও ঝুঁকে পড়েন। (সূত্র- ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিকথা—শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত, "নাগরিক" ১লা জুলাই। ১৯৬৭ ইং)

১৯২১ খৃঃ সারা ভারতে অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ হয়। আন্দোলনের ঢেউ স্বাধীন ত্রিপুরার পাহাড়ে এসেও ধাক্কা দিল। আন্দোলন আগরতলা থেকে বিলোনীয়া, কৈলাশহর, ধর্মনগর প্রভৃতি মহকুমাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল। (সূত্র—ত্রিপুরার ইতিহাস—সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, পৃঃ—৩১) —খিলাফত আন্দোলন কৈলাশহর, ধর্মনগর মহকুমার সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ কৃষিজীবি, চা-শ্রমিক, চিনি বাগানের শ্রমিক, প্রভৃতিকে জীবন নাড়া দিয়েছিল। মহকুমার গঙ্গানগর, মুরুতৈল, মানিকভাণ্ডার প্রভৃতি অঞ্চলে আন্দোলনের সমর্থনে ব্যাপক সভা, শোভা যাত্রা সংগঠিত হল। আন্দোলনের এক পর্যায়ে—হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ এক ধর্ম সভা গঠন করেছিল এবং রাজার আদালত বর্জন করে এই ধর্ম সভার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সংঘটিত সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ মিটমাট আরম্ভ করেছিল। (সূত্র-Tripura District gazetteers, 1975, Page 23)। তৎকালীন রাজ শক্তি এই আন্দোলনগুলিকে খুব একটা সুনজরে দেখেনি, ফলে "আন্দোলনকারীদের রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হল।

(সূত্র—Tripura Dist. gazetteers, 1975—Page 121)। এদিকে আগরতলা সহরের তৎকালীন ব্যবসায়ী সমাজও এই অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেনি।

১৯২১ খৃঃ মে মাসে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে গান্ধীজীর ডাকে যে সমস্ত চা-শ্রমিক কাছাড়ের বাগানগুলি ছেড়ে দেশের দিকে রওনা হয়েছিল, বাগান মালিকদের প্ররোচনায় ব্রিটিশ সরকার

তাদের চাঁদপুর ঘাটে আটক করল। ব্রিটিশ সরকার এই শ্রমিকদের আটক করেই ক্ষান্ত হলনা, রাতের অন্ধকারে একদল সশস্ত্র গুর্খা সৈন্য এই নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর লেলিয়ে দিল। এদের নির্মম অত্যাচারে অনেক চা-শ্রমিক আহত এবং নিহত হল। পরবর্ত্তী সময়ে এই নিহত শ্রমিক-দের দেহগুলিকে পাথরে বেঁধে চটের বস্তায় বস্তাবন্দী করে মেঘনার জলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। এই অত্যাচারের খবরে সারা দেশে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল এবং প্রতিবাদে প্রথমে জাহাজ এবং রেলওয়ে পোর্টাররা ধর্ম্মঘটে নামে পরবর্ত্তী সময়ে চাঁদপুর ঘাটের জাহাজের কর্ম্মচারী এবং আসাম বেঙ্গল রেল কর্ম্মচারীরাও ধর্ম্মঘটের সামিল হয়। এই প্রতিবাদ এবং ধর্ম্মঘটের ঢেউ এসে ত্রিপুরার পাহাড়েও ধাক্কা দিল। ধর্ম্মঘট চলা-কালীন সময়ে জন সাধারণ ইউরোপীয়দের কাছে জিনিষ পত্র বেঁচা কেনা বন্ধ করে দিল। এই ঘটনার পরিণাম আখাউড়া রেল ষ্টেশনে কর্ম্মরত ইউরোপীয়ান এবং এ্যাংলো—ইণ্ডিয়ান রেল কর্মচারীদের অসুবিধার সৃষ্টি হল। স্থানীয় জনগন এদের কাছে জিনিষ পত্র বেচ-কেনা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল। এদিকে রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের রেশন ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল এই অবস্থায় তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার, ত্রিপুরার রাজদরবারে এক জরুরী বার্ত্তা পাঠিয়ে এই সমস্ত কর্ম্মচারীদের কাছে সাহায্য পাঠাতে অনুরোধ করলেন রাজ্য সরকারের অনুরোধে আগরতলার ব্যবসায়ী সমাজ এই সমস্ত ইউরোপী-য়ান কর্ম্মীদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র সরবরাহ আরম্ভ করল। এই ঘটনার পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে আখাউড়া এবং তৎসংলগ্ন বাজার-গুলির ব্যবসায়ীরা আগরতলা বাজার বয়কট করে তাদের সঙ্গে সমস্ত লেন দেন বন্ধ করে দিলেন। তখন এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে, আগরতলা রাজপ্রাসাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় মাছ আখাউড়া থেকে আসা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। (সূত্র—CPI(M)-promises, prospects problems--Bhabani Sengupta-page-171)। এমনকি মোগড়া থেকে আগরতলা আসার পথে নৌকার মাঝি ত্রিপুরার রাজ মন্ত্রীকে নৌকা ভাড়া দিতেও অস্বীকার করেছে। সেই সময়ে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে ত্রিপুরার রাজ দরবার তৎকালীন Political Agent কে No: 566/1-16Dated 11-6-1921- এ যে গোপনীয় চিঠি পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি—"I was further informed

that our bazar at Akhaura in connection with the porter trouble at Chandpur which lead to the Strick on the Railway went. On Hartel for two days. On 27th I received information that there had been meeting at Akhaura presided by Babu Dhirendra Nath Dutta, a Junior Pleader of Comilla Bar, in which there was a discussion and perhaps a resolution of Boycotting Agartala bazar as a retaliation for the action of the Durbar in supplying provisions to the European Staff"—

এক সময়ে এই আন্দোলন শেষ হল। ভ্রাতৃসংঘ যখন সৃষ্টি হয় সংঘের সৃষ্টি কর্তাদের সামনে এই ঘটনাগুলি ছিল. ১৯২৯ খৃঃ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরের বছর গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেন। এই সময়ে যে গণ জাগরণ এবং তার পাশাপাশি অসংখ্য বৈপ্লবিক কর্ম্ম প্রচেষ্টা আমাদের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করে তুলেছিল তেমনি এই গণ জাগরণ এবং আন্দোলনে ত্রিপুরার জনগণও সামিল হয়েছিল। ১৯৩০ খৃঃ ভ্রাতৃ সংঘের উদ্যোগে আগরতলা সহরে স্বাধীনতা উৎসব পালন করা হয়। সেই স্বাধীনতা উৎসবে আগরতলায় ছাত্র যুবকদের সাথে শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশ কিছু মানুষ যোগদান করেছিল। তৎকালীন রাজ্য সরকারের কিছু কর্ম্মচারীও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই উৎসবে সামিল হন। এই ঘটনায় তৎকালীন সামন্ত সরকারকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলল। ফলে সরকারী আদেশে প্রচুর ছাত্র. যুবককে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করা হল। শুধু ছাত্রদের বহিষ্কার করেই রাজ শক্তি ক্ষান্ত রইলনা। এই বহিষ্কৃত ছাত্রদের অনেক অভিভাবককেও রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হল। অপর দিকে রাজ সরকারের কর্ম্মচারীদের মাঝে কাউকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত মনে হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুধু ছাটাই-ই নয় রাজ্য থেকেও তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতেও যখন রাজ্যের আন্দোলনের তীব্রতা কমেনি তখন ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় সংঘের অনেক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে রাজ্যের বাইরে ব্রিটিশ কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে ১৯৩২-৩৩ সালের মধ্যে সমস্ত সক্রিয় কর্মী-

দের গ্রেপ্তার করার ফলে আন্দোলন তখনকার মত কিছুটা ভাটা পড়ে। ভাতৃ সংঘের এই আন্দোলন আগরতলা শহরের শ্রমিক কর্মচারীদের মনেও আন্দোলন এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রেরনা জুগিয়েছিল। কিন্তু উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তারা তখন সংঘবদ্ধ হতে পারেনি। এদিকে কারান্তরালে থাকা অবস্থায় সংঘের কর্মীদের রাজনৈতিক মনোজগতে এক বিরাট পরিবর্ত্তন আসে। এক দল সাম্যবাদী মতাদর্শের এবং চিন্তা ধারায় প্রভাবিত হলেন, এবং অপর দল গান্ধী প্রবর্ত্তিত অহিংস মতবাদে অনুপ্রানিত হলেন। ১৯৩৭ সালের শেষ দিকে জেল থেকে বেড়িয়ে এক দল সাম্যবাদী মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের দাবীতে ত্রিপুরা রাজ্য জন মঙ্গল সমিতি সৃষ্টি করলেন যার নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন বীরেন দত্ত, প্রভাত রায় বংশী ঠাকুর, গঙ্গা প্রসাদ শর্ম্মা, দেব সেন মোহন চৌধুরী গং। ঠিক তারই কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আগরতলায় অহিংস মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে ত্রিপুরা রাজ্য গণ পরিষদ সৃষ্টি করলেন, যার নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন শচীন্দ্রলাল সিংহ, হরিগঙ্গা বসাক, সুখময় সেনগুপ্ত প্রভৃতিরা। উভয় দলের কাছেই রাজ্যে কৃষক শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রথম দল অর্থাৎ জনমঙ্গল সমিতি সারা রাজ্যে কৃষক সংগঠনের সাথে সাথে পাহাড় অঞ্চলের গেন্ডমজুর ও চা-শ্রমিকদের সংগঠিত করতে এগিয়ে গেলেন, আর গন পরিষদ কর্ম্মীরা প্রথমে "ত্রিপুরা রাজ্য মজুদুর সমিতি" নাম দিয়ে শ্রমিক সংগঠন করে আন্দোলনের দিকে এগিয়ে গেলেন। উক্ত সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগিচায়, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙরদের ভিতর এবং "রাজধানীর মোটর শ্রমিকদের" ভিতর সংগঠন গড়ার চেষ্টা করেন এবং তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে আন্দোলনে নামেন। (সূত্র ৺হরিগঙ্গা বসাকের ১৯৪৫ ইং সনের রচনা, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় মনিময় দেববর্মার ধারাবাহিক রচনা "ত্রিপুরা প্রজা আন্দোলন, কিছু তথ্য।" ৫/১/৭৮ইং সংখ্যায় পুনঃ প্রকাশিত)।

সম্ভবত সুখময় বাবুদের নেতৃত্বে গড়া "ত্রিপুরা রাজ্য মজদুর সমিতি-ই এ রাজ্যের প্রথম শ্রমিক সংগঠন। পরবর্ত্তী সময়ে গণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুখময় বাবুর নেতৃত্বে চিত্ত চন্দ (বাম ফ্রন্টের পৌর কমিশনার) নীলু মুখার্জী (নীলু মাষ্টার) শান্তি দাসগুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় গণ পরিষদ কর্ম্মী প্রথম পৌর ধাঙরদের সংগঠিত করতে এগিয়ে এলেন।

ধাঙরদের মধ্য থেকে তাদের সাথে এসে যোগ দিলেন শ্রী নিবাস বধাই ধামুক, গোবর্ধ হরিজন, গোপাল ধানুক প্রভৃতিরা।

১৯১১ খৃঃ মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের রাজত্ব কালে তিন বর্গমাইল এলাকা নিয়ে আগরতলা পৌর সভার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করছি ১৩০৭ ত্রিং ১১ ই বৈশাখের (১৮৯৭ ইং) ৩৯ নং গেজেট মেমো থেকে জানা যায় নূতন ও পুরাতন আগরতলায় দুইটি পৌর সংস্থা ছিল। মূল প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসছি,—পৌর সভা প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ দিন পর ও তার শ্রমিক কর্মচারী বিশেষতঃ এই ধাঙরদের বেতন ভাতা, বাসস্থান, ছুটি ইত্যাদির কোন নিয়ম কানুন ছিলনা। সেই সময় কর্তা ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ মর্জির উপর তাদের চাকুরী থাকা না থাকা নির্ভর করত। এই শ্রমিকদের সংগঠিত করে ১৯৪১ খৃঃ আন্দোলনে নামালেন সুখময় বাবুরা। এখানে প্রয়াত হরিগঙ্গা বসাকের পূর্বোক্ত রচনায় ধাঙর ধর্মঘট সম্পর্কীয় অংশ থেকে কিছু অংশ পাঠকের অবগতির জন্য তুলে ধরছি. "১৯৪১ সালে ত্রিপুরা রাজ্য মজদুর সমিতির নেতৃত্বে আগরতলার মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙররা যুদ্ধ কালিন ভাতা বেতন বৃদ্ধি, মেথর ধাঙরদের গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের পর পুরা বেতন ছুটি, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, চাকুরীর স্থায়ীত্ব ইত্যাদির সময়োচিত দাবী আদায় করার জন্য এক যোগে তিন দিবস কোন ধাঙর কাজে যোগ দান না করায় সরকার দাবী মানিয়া লইয়া আপোষ করিতে বাধ্য হয়। ইহার কয়দিন পরই ত্রিপুরা রাজ্য হইতে মজদুর সমিতির নেতৃবৃন্দকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বহিস্কৃত করা হয়।"

"ধাঙর ধর্মঘটের সাফল্য লক্ষ্য করিয়া মজদুর সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যের চা-বাগানের শ্রমিকদের এবং স্টেট ম্যাচ ফ্যাক্টরী শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার কাজে বিশেষ ভাবে যত্নবান হন। কোন কোন চা-বাগানে অল্পদিনের মধ্যেই সাড়া পরে যায়"—

এই হরিজন ধর্মঘট প্রসঙ্গে প্রয়াত ত্রিপুর সেন তাঁর "Tripura in Transitionr" বই এর ২৬ এবং ২৭ পৃষ্ঠায় ধর্মঘটের সময় কাল হিসাবে উল্লেখ করেছেন ১৯৩৮-৩৯ সাল এবং ধর্মঘটের স্থায়ীত্ব বলেছেন ৭ দিন। প্রয়াত হরিগঙ্গা বসাক এই আন্দোলনের সাথে নিজেই যুক্ত ছিলেন এবং ১৯৪৫ খৃঃ দমদম সেন্ট্রাল জেইলে বসে এই "স্মৃতিচারণ" লিখেছেন। অন্য দিকে প্রয়াত ত্রিপুর সেন ঘটনার

দীর্ঘদিন পর সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে এই আন্দোলন বর্ণনা করেছেন। উভয়ই ত্রিপুরা রাজ্যের বিগত শ্রমিক, কৃষক, গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির সাথে জড়িত ছিলেন। আদর্শ এবং তার প্রয়োগ পরস্পর বিরোধী হতে পারে কিন্তু ঘটনার সময় কাল এবং স্থায়িত্ব ও যদি পরস্পর বিরোধী হয় তবে সাধারণ পাঠকের দুর্দশার অন্ত থাকেনা। প্রয়াত ত্রিপুর .সন তাঁর এই Tri ura in Transition বইয়ে "হরিজন ধর্ম্মঘট" কে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম শ্রমিক ধর্ম্মঘট বলে উল্লেখ করেছেন। হরিজন শ্রমিক দ্বারা সংগঠিত হিসাবে যদিও এই ধর্ম্মঘট প্রথম ছিল, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক ধর্ম্মঘট হিসাবে এই ধর্ম্মঘট ছিল তৃতীয় ধর্ম্মঘট।

ধাঙর ধর্ম্মঘটের পর মজদুর সমিতি ম্যাচ ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের যদিও কিছুটা সংগঠিত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু চা-শ্রমিকদের মাঝে সমিতি কোন সংগঠনই গড়তে পারলেন না। এই ঘটনার দীর্ঘদীন পরে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ খৃঃ স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে শ্রী অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী চ-শ্রমিকদের সংগঠিত করতে এগিয়ে এলেন।

১৯৩৩ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে Inter provinc al conspiracy case আরম্ভ হয়, মামলার অধিকাংশ আসামী তখন পলাতক, গোপাল দত্ত প্রমুখ গ্রেপ্তার হয়ে বহরমপুর ডিটেনসন ক্যাম্পে। এই অবস্থায় ১৯৩৫ খৃঃ ২০শে জানুয়ারী পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, শ্যাম বিনোদ পাল, দেবপ্রসাদ সেন, পারুল মুখার্জী প্রমুখ টিটাগড়ের এক বাস বাড়ী থেকে গেপ্তার হলেন। পুলিশ আগের মামলাটির সঙ্গে এই মামলাটি যোগ করে Inter provincial and Titagar Conspiracy Case নাম দিয়ে নুতন করে মামলা আরম্ভ করল। বিচারে ১৬ জনের ৭ থকে ১০ বছর শ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৮ খৃঃ প্রথম দিকে দেবপ্রসাদ সেন, গোপাল দত্ত প্রমুখ ছাড়া পেলেন।

১৯৩৮ খৃঃ ১১ ই মে থেকে স্বামী সহজানন্দের সভাপতিত্বে কুমিল্লায় সারা ভারত কৃষক সভার অধিবেশন আরম্ভ হল। (সূত্র — অমৃতবাজার পত্রিকা ১৫ ই মে ১৯৩৮ ইং), এই সম্মেলনে তৎকালীন সারা ভারত কৃষক সভার সর্ব্বভারতীয় নেতা কমঃ মুজফ্ফ আহমেদ, বঙ্কিম মুখার্জী, জয় প্রকাশ নারায়ন, শীল ভদ্র, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, কমল সরকার প্রমুখ যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে কুমিল্লার নেতা ললিত

বর্ম্মনের নেতৃত্বে কনী মজুমদার, কৃষ্ণ সুন্দর ভৌমিক, ইয়াকুব মিঞা, অমূল্য কাঞ্চণ দত্ত রায়, চন্দ্র শেখর দাস, কান্তি সেন, বঙ্কিম চক্রবর্ত্তী, রবি গোস্বামী, সমর পাল প্রমূখ স্থানীয় নেতা ও কর্ম্মীরা যোগ দিয়েছিলেন। (সূত্র-ত্রিপুরাঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে অখিল নন্দী (শাস্বত ত্রিপুরা পৃঃ ৫৮) ত্রিপুরা (আগরতলা) থেকে এই সম্মেলনে সদ্য জেল প্রত্যাগত কম অনন্তলাল দে গোপাল দত্ত জিতু দত্ত প্রেমাংশু চৌধুরী (টিপু চৌধুরী), নলিনী সেন, উষা দেববর্ম্মা, নিমাই দেববর্ম্মা প্রমুখ যোগদান করেন (সূত্রঃ-"আমার স্মৃতিতে ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট ও গনতান্ত্রিক আন্দোলনের পটভূমি"—বীরেন দত্ত, পৃঃ১৭)—সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে কৃষক সমীতি গঠন এবং আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য গ্রামে গ্রামে যেতে আরম্ভ করে, ফলে আন্দোলন গতিবেগ পায়। আগরতলার প্রতিনিধিরাও আন্দোলন ও সংগঠন গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিরে এলেন।

১৯৩৯ খৃঃ ঢাকা, রায়পুরা ইত্যাদি অঞ্চলে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গায় বেশ কিছু হিন্দু উদ্বাস্তু হয়ে (যাদের আত্মীয় স্বজন পূর্ব্ব থেকেই রাজ্যে চাকুরী অথবা ব্যবসার খাতিরে এখানে বসবাস করেছিলেন) এখানে এসে (আগরতলায়) উঠলেন। ৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮ ত্রিঃ সনে রাজ সরকারের এক আদেশে এই সদ্য আগত উদ্বাস্তু যারা এই রাজ্যে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক তাদের নাগরিক অধিকার দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। (সূত্র—রাজন্য ত্রিপুরার সরকারী বাংলা—শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা। পৃষ্ঠা—২৩৭)। রায়পুরা দাঙ্গায় বাস্তুচ্যুত হয়ে যারা এ রাজ্যে এলেন-এদের মধ্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক যেমন ছিলেন, তেমনি কিছু রিক্সা চালক এবং রিক্সা মালিকও এসেছিলেন। এদেশে এসে ঐ রিক্সাচালকরা তাদের পুরানো পেশাই বেছে নিল, এদের আগমনের আগে আগরতলা শহরে কোন রিক্সা ছিলনা।

রিক্সা চালাতে এসে এই রিক্সা চালকরা প্রথম পেশাগত সংঘর্ষের সম্মুখীন হয় ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের সাথে যখনই উভয়ের মধ্যে এ জাতীয় কোন সংঘর্ষ হত দেখা যেত পুলিশ এবং পৌর কর্ম্মচারীরা এই গাড়োয়ানদের পক্ষ অবলম্বন করে রিক্সা চালকদের মার ধর করত। এর সাথে এসে যোগ হল রাজ পরিবারের কতিপয় সদস্যের জুলুম।

তাঁরা রিক্সায় চড়লে পারত পক্ষে ভাড়া দিতে চাইতেন না। বা ভাড়া চাইলে অনেক সময় চড় চাপড় মারতেন। তার উপর রিক্সা ভাড়া নিয়ে মালিকের জুলুম, এই ছিল তাদের নিত্য দিনের ঘটনা। এই অবস্থায় কতিপয় রিক্সা চালকের উদ্যোগে, গোপাল দত্ত, নিমাই দেববর্মা প্রভৃতির চেষ্টায় রিক্সা মজদুর ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন এই রিক্সা চালকদের অনেকেই যেমন নারায়ন গঞ্জ অঞ্চলের শ্রমিক আন্দোলন দেখেছে, তেমনি অনেকের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কিছুটা অভিজ্ঞতাও ছিল। গোপাল বাবু তাঁরা নবগঠিত ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের সংগঠিত করে তাদের আন্দোলনের দিকে এগিয়ে নিলেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিক্সা শ্রমিকদের এই সমস্ত অত্যাচার থেকে বাচতে সক্ষম ও হয়েছিলেন। রিক্সা চালকদের সংগঠিত করতে পারলেও ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানদের নিয়ে কোন সংগঠন গড়তে পাড়লেন না। ১৯৪০ খৃঃ ১লা মে খোস বাগানের মাঠে পণ্ডিত গঙ্গা প্রসাদ শর্মার সভাপতিত্বে এবং গোপাল বাবুদের নেতৃত্বে এবং নবগঠিত ইউনিয়নের সহযোগীতায় আগরতলা শহরে প্রথম মে দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই মে-দিবসের জমায়েতে আগরতলা শহরের তৎকালীন সময়ের বঞ্চিত অংশের শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষদের তাঁরা সামিল করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকারের প্রচণ্ড চাপে একমাত্র লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন ছাড়া সেই দিন তারা বাকি অনুষ্ঠান করতে পারেন নি। (সূত্র—এই অংশের তথ্য-উক্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সক্রীয় কর্মী, গোপাল দত্ত, নিমাই দেববর্মা, গঙ্গা প্রসাদ শর্মা এবং অপরাপর প্রত্যক্ষ দর্শির নিকট থেকে সংগৃহীত।)

১৯৪০ খৃঃ রাজদরবারের আদেশে রামনগর মুসলমান কৃষকদের বিনা ক্ষতিপূরনে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র আরম্ভ হল। জনমঙ্গল এবং গণ পরিষদ নেতারা এই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করলেন। আন্দোলন এখন এক পর্য্যায়ে গিয়ে পৌছলে, রাজসরকারের এক আদেশে শচীন্দ্র লাল সিংহ সহ অনেক নেতাকে রাজ্য থেকে বহিস্কার করা হল। আন্দোলন তখনকার মত স্তিমিত হল।

১৯৪৫ খৃঃ দশরথ দেব, বীরেন দত্ত, সুধন্যা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা প্রমুখের নেতৃত্বে শোষণ, কু-আচার, কু-সংস্কার, অশিক্ষার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের ব্রত নিয়ে জনশিক্ষা সমিতি সৃষ্টি হয়।

এই জনশিক্ষা সমিতি পাহাড় অঞ্চলের ছোট চাষী, ক্ষেত মজুর ইত্যাদির সাথে চা-বাগান অঞ্চলের শ্রমিকদের মাঝেও শিক্ষাবিস্তার এবং সামাজিক চেতনা ও অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের কাজে ব্রতী হলেন এবং এই বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবি মজুরদের ঐক্যবদ্ধ ও রাজনৈতিক সচেতন করে বিপ্লবী কৃষক শ্রেণীর যোগ্য বিপ্লবী মিত্র বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে আরম্ভ করলেন।

১৯২৩ খৃঃ যে পরিবহন শিল্প ত্রিপুরায় গড়ে উঠল তিরিশের দশকের দিকে শেষ এসে এই শিল্পের পরিপূরক এবং সহায়ক আরো কয়েকটি ছোট ছোট শিল্পও ত্রিপুরায় গড়ে উঠল। এদিকে ত্রিপুরার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও ব্যপ্ত হয়েছে এবং ব্যবসা যখন স্থানীয় দিকে এগিয়ে এসেছে তখন লাইসেন্স ফি, রোড ট্যাক্স ইত্যাদির পরও 'রাজমন্ত্রীর প্রস্তাব" মতে আখাউড়া — আগরতলা রাস্তা 'চলাচলের অধিকতর উপযোগী' রাখার "ব্যয় নির্ব্বাহ এর প্রয়োজনে ষ্টেট গাড়ী ব্যতীত সকল প্রাইভেট ও ভাড়াটিয়া মোটর বাস, লরি, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদিকে প্রতিবারের যাতায়াতে সং চার আনা হিসাবে এবং বেসরকারী ঘোড়ার গাড়ী গুলিকে এক আনা ছয় পাই হিসাবে ট্যাক্স আদায়ের ও ব্যবস্থা হয়েছে। (সূত্র:— রাজন্য ত্রিপুরার সরকারী বাংলা পৃষ্ঠা ৪১৯ ৪৮১) সেই সময়ে এই ট্যাক্স আদায়ের যে টিকেট প্রচলন হয়েছিল তার একটি নমুনা তুলে ধরছি —

টিকেট

ট্যাক্স— চারি আনা

টিকেটের ক্রমিক নম্বর —

মটরের নম্বর —

টিকেট ইস্যু করার তারিখ —

PASS

টিকেট প্রদান কারীর স্বাক্ষর

পদ —

রাজস্ব ফরম নং ১১৫ (ক)

ষ্টেট প্রেস-২-৮-৪৮. ৩০.০০০

(সূত্র:— শ্রদ্ধেয় মানময় দেববর্ম্মার সৌজন্যে প্রাপ্ত)। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মোটর গাড়ী এবং ঘোড়ার গাড়ীর মালিকের এই নতুন

ট্যাক্স ব্যবস্থাকে ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারল না। তাদের বক্তব্য ছিল গাড়ীর বৈধ অনুমতি (লাইসেন্স) নেওয়ার সময়ই এই রোড টেক্স আদায় করে নেওয়া হয়, বর্ত্তমানে প্রতি (ট্রিপের জন্য) বাব বাতায়াতে ৪ আনা + ৪ আনা = আনা আনা ট্যাক্স জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। সমসাময়িক সময়ে প্রায় দেড়লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে "Agartala Motor Transport Company" (AMTC) নামে এক যৌথ মালিকানাধীন পরিবহন পরিবহন কোম্পানী পরিবহন ব্যবসায় পদার্পন করল। রাজ পরিবারের কয়েক জন সদস্য এই নবগঠিত কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন, ফলে পরিবহন ব্যবসার যত রকম সুযোগ সুবিধা এই নবগঠিত কোম্পানী একক ভাবে ভোগ করতে আরম্ভ করল। এই অবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মোটর গাড়ী গুলি দিন দিন ব্যবসার দিক থেকে লোকসান দিয়ে চলছে। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করছি, এই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়ীর মালিকরা সেই সময় নিজেরাই নিজেদের গাড়ী অনেকেই পরিচালনা করতেন। ফলে এই সমস্ত গাড়ী গুলির মালিকরা নিজেরাই শ্রমিক ও মালিক ছিলেন। অন্যদিকে যে সমস্ত গাড়ী বেতন ভূক্ত ড্রাইভার ক্লীনারের দ্বারা পরিচালিত হত সেই ড্রাইভার ক্লীনারদের ও একটা নির্দিষ্ট মাসিক বেতনের মৌখিক চুক্তিতে নিযুক্ত করা হত। এই এই অবস্থা অবশ্য সত্তরের দশকেও ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে ড্রাইভার ক্লীনারদের লিখিত নিয়োগ পত্র দানের নিয়ম বাধ্যতামূলক বলে প্রচলিত করে। বেতন ও হাজিরার দিক থেকে সেযুগে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ ছিলনা। এই অবস্থায় শ্রমিকদের সমস্ত স্বার্থগুলি রক্ষনাবেক্ষন এবং শিল্পে নিযুক্ত অন্যান্য শ্রমিক কর্ম্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯৩৯—৪০ খৃঃ মনোহর বিশ্বাস, আজমল দাস, গিরিজা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির চেষ্টায় এবং শ্রমিকদের উৎসাহে "ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কাস এসোসিয়েশন" গড়ে উঠে। পরবর্ত্তী সময়ে সংগঠনে এসে যোগ দিলেন উপেন্দ্র বনিক, বিদ্যাধর। ত্রিপুর সেন প্রভৃতি। (সূত্রঃ- Tripura in Transation—Tripur Sen, Page—36) অপরদিকে আগরতলা মোটর ট্রেন্সপোর্ট কোম্পানীর শ্রমিকরা ছিল টিপেরা মোটর শ্রমিক সংঘের সদস্য, যার প্রধান দপ্তর ছিল অধুনা বাংলা দেশের কুমিল্লা সহরে। (সূত্র :- ত্রিপুরার কথা— ২২/১২/৬০ ত্রিং)

১৯৩৮ খৃঃ শেষ দিকে তৎকালীন মহারাজার এক আদেশে "দি

আগরতলা মোটর ট্রেন্সপোর্ট কোম্পানী" কে বাৎসরিক দশ হাজার টাকার বিনিময়ে আগাউড়া আগরতলা রাস্তায় গাড়ী চলাচল এবং যাত্রী পরিবহনের এক "মনোপলি"— আদেশ প্রদান করা হয়। এই "মনোপলি" আদেশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ ছিল,— ডাক বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সাথে তখন পর্যন্ত যে গাড়ীর মালিকদের চুক্তি ছিল তাদের গাড়ী এই রাস্তায় এক মাত্র ডাক আনা নেওয়ার কাজে চলতে পারবে। যাত্রী পরিবহনের উপর যদিও নিষেধাজ্ঞা ছিল, মালপত্র পরিবহনের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিলনা। এই "মনোপলি" আদেশের প্রতি লিপি এখানে তুলে ধরছি —

পলিটিক্যাল বিভাগ

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ ত্রিং

(সপ্তত্রিংশ ভাগ, বিশেষ সংখ্যা)

মনোপলি প্রদান

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মানিক্য বাহাদুরের গত ২/৮/৪৮ ত্রিং তারিখের আদেশে আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে দি আগরতলা মোটর ট্রেন্সপোর্ট কোম্পানীকে (The Agartala Motor Transport Company) আখাউড়া রাস্তায় সার্ভিসের জন্য পাঁচ বৎসরের লিখিত প্রতি বৎসর ছয় মাস অন্তর সমান দুই কিস্তিতে নিম্নলিখিত হারে সরকারকে অগ্রিম Royalty দেওয়ার সর্তে Monopoly দেওয়া হইয়াছে।

১ম বৎসর=৮, ০০০

২য় বৎসর=৯, ০০০

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বৎসর=১০, ০০০

কেবল মাত্র মেইল বাহী মটর পোষ্ট অফিস কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার বর্ত্তমান চুক্তির ম্যাদ অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত এই রাস্তায় চলাচল করিতে পারিবে। কিন্তু ঐ গাড়ীতে কোন যাত্রী লাইতে পারিবে না।

ইতি— জ্যোতিশ চন্দ্র সেন

মন্ত্রী—

১৯৷১১ ৩৮ ইং

(সূত্রঃ-ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সঙ্কলন, পৃষ্ঠা-১৫২)

অনুরূপ অপর একটি মনোপলি কুমিল্লার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এক আইরিশ কোম্পানীকে দেওয়া হয়েছিল। এই কোম্পানীর মালিক ছিলেন পল ডেলহনী (প্রকাশ্যে পিল সাহেব). তার পূর্ব্ব পুরুষ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এদেশে এসে কুমিল্লায় স্থিতি হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই কোম্পানীর মোটর এবং নদী পথে লঞ্চ সার্ভিস ছিল। রাজ্য সরকার থেকে এই কোম্পানীকেও পরবর্ত্তী সময়ে অনুরূপ চুক্তিতে কুমিল্লা-সোনামুড়া-উদয়পুর-আগরতলা রাস্তায় পরিবহন ব্যবসার প্রয়োজনে পাঁচ বছরের জন্য মনোপলি দেওয়া হল। উদয়পুর-সোনামুড়া রাস্তা এবং সোনামুড়া-আগরতলা রাস্তার সংস্কার, রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্বও এই কোম্পানীর ছিল। এর জন্য কোম্পানীর নিজস্ব রোড লেবার, গ্যাংমেন ইত্যাদিও ছিল। কোম্পানীর সদর দপ্তর কুমিল্লায় ছিল, এবং শ্রমিক কর্ম্মচারীরা টিপেরা মোটর শ্রমিক সংঘের সদস্য ছিল। পাহাড়ী বর্ষায় যখন সোনামুড়া-উদয়পুর রাস্তা গাড়ী চলা চলের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পরত তখন কুমিল্লা থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত গোমতী লঞ্চ সার্ভিস চলু করে পরিবহন ব্যবস্থা ঠিক রাখত। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে সোনামুড়ায় অবস্থিত কোম্পানীর গাড়ী গুলি মাখন দত্ত, দেবু চৌধুরী (দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী) উদয়পুরের রাখাল দত্ত এবং কুমিল্লা সিংহ প্রেসের মালিক অরুন সিংহ আনুমানিক ৪৫ হাজার টাকায় কিনে এক নুতন যৌথ অংশীদারী কোম্পানীর উদ্বোধন করেন। অংশীদারী ঝামেলায় বর্ত্তমানে এই কোম্পানীর ও এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। মুল প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসছি, সরকারী আদেশে যে কথা থাকুকনা কেন বাস্তব ক্ষেত্রে এই মনোপলি প্রাপ্ত কোম্পানী দুটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়ী গুলিকে মালামাল বহন করতে দিতেও চাইতনা। ডেলহনী কোম্পানী সোনামুড়া-উদয়পুর রাস্তায় অন্য কোন যাত্রী বাহী গাড়ীকেও চলাচল করতে দিতনা, ফলে রাজ্যের অন্যান্য গাড়ীর মালিকদের সাথে কোম্পানী দুটির ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হল। কোন কোন ক্ষেত্রে এই ঝগড়া-বিবাদ, শ্রমিকে শ্রমিকে মারামারির পর্য্যায়ে গিয়েও দাড়াল। তৎকালীন সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে জানিয়েও ছোট গাড়ীর মালিকরা এই অন্যায় অবিচারের কোন সুষ্ঠু বিচার পায়নি। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ নীরব ভুমিকা পালন করে পরোক্ষে মনোপলি প্রাপ্ত কোম্পানী দুটিকেই সাহায্য করছিল। এই অবস্থায় অনেক মালিক তাদের ব্যবসা

গুটিয়ে নিতে চাইল; ফলে এই পেশায় নিযুক্ত এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কর্ম্মচারী ছাটাই-এর মুখে এসে দাড়াল। অন্য দিকে মনোপলি প্রাপ্ত কোম্পানীর, বিশেষতঃ এ, এম, টি, সি, র কর্ম্মচারীদের যাত্রীদের সঙ্গে ব্যবহার অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের ছিল। সাধারন যাত্রীদের সাথে এদের ব্যবহার যেমন নিকৃষ্ট ধরনের ছিল, মালপত্র পরিবহনের সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উপর এরা অনেক সময় জুলুম চালাত। এমন নজির ও ছিল ভাড়া নিয়ে বচসা করে, এই কোম্পানীর শ্রমিক কর্ম্মচারীরা যাত্রী-দের মালপত্র রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেদিত। তৎকালীন পত্র পত্রিকাতেও এদের অত্যাচার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদন বেরিয়েছিল। ফলে সাধারন যাত্রী এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এই কোম্পানীর উপর অত্যন্ত রুষ্ট ছিল। (সূত্রঃ-চিনিহা ১১।৪।৫৯ ত্রিং)।

এই অবস্থায় ১৯৪০ খৃঃ প্রথমদিকে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন গাড়ীর মালিক এবং শ্রমিকরা এই মনোপলি বাতিলের দাবীতে ওয়ার্কাস এসো-সিয়েশনের নেতৃত্বে আবেদন নিবেদন আরম্ভ করল। এদিকে প্রজামণ্ডল এবং গণ পরিষদ উভয়ই এই মনোপলি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে রাজদরবারে এই ব্যবস্থা বাতিলের দাবীতে স্মারকলিপি দিল। সমস্ত আবেদন নিবেদন যখন ব্যর্থ হল, শ্রমিকরা ওয়ার্কস এসোসিয়েশনের নেতৃত্বে এই মনোপলি বাতিলের দাবীতে আন্দোলনে নামল। ১৯৪১ এর মাঝামাঝি থেকে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল।

কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে প্রতিদিন বিকালে এই মোটর শ্রমিকরা মিছিল করে রাস্তার মোড়ে মোড়ে জমায়েত হয়ে জন সাধারনের কাছে এই মনোপলির কুফল, সরকারী জুলুম, যাত্রীদের সাথে কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রেখে এই মনোপলি বাতিলের দাবী জানা-তেন। সেই সময়ে এই মোটর শ্রমিকদের আন্দোলন অন্যস্তরের শ্রমিক-দের বিশেষতঃ ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান দের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। এই গাড়োয়ানদের মধ্যে, সরকারী আদেশে আখাউড়া আগরতলা রাস্তায় প্রতিবার যাতায়াতে মং তিন আনা হিসাবে ট্যাকস, পৌর এবং আরক্ষা কর্ম্মচারীদের অত্যাচার, জুলুম ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল। ফলে মোটর শ্রমিকদের এই জমায়েত গুলিতে সে সময় গাড়োয়ানরাও প্রচুর সংখ্যায় অংশ গ্রহন করত। মনোহর বিশ্বাস, আজমল দাস, উপেন্দ্র বনিকদের সাথে প্রয়াত ত্রিপুর সেন ও আন্দোলনের সামনের সারিতে এসে

দাঙ্গালের এবং দিনের পর দিন এই মনোপলি বাতিলের দাবীতে প্রচার অভিযান চালিয়ে গেলেন। সেই আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী সাপ্তাহিক "ত্রিপুরা" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই লেখককে বলেছেন, আন্দোলনরত মোটর শ্রমিকরা তাদের দাবীর শ্লোগানের সঙ্গে সেদিন আরও দুটি নুতন শ্লোগান যোগ করেছিল সেগুলি—

"ইয়ে ইমারত কোন বানায়া ইয়ে মজদুর-মজদুর
ইয়ে সরক কোন বানায়া-মজদুর, মজদুর"—

সে যুগের সেই অসংগঠিত এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চেতনা বর্জিত এক দল শ্রমিকের কাছ থেকে এ জাতীয় শ্লোগান কম তাৎপর্য্যপূর্ণ ছিলনা। অপরদিকে এই শ্লোগান গুলিই ত্রিপুরার আগামী দিনের শ্রমিক আন্দোলন কোন রাস্তায় যাবে তার ইঙ্গিত বহন করেছিল।

শ্রমিকরা দিনের পর দিন এভাবে চেঁচিয়ে যাবে আর "সদাশয়" সরকার চুপচাপ শুনে যাবে এমন পরিস্থিতি সামন্ত শাসকের "রাজধর্ম" ছিলনা। বিশেষতঃ রাজপরিবারের এবং অনুগৃহীত অনেকেই যখন এই কোম্পানীর সাথে জড়িত ফলে আন্দোলন ভাঙ্গতে ব্যাপক দমন পীড়ন আরম্ভ হল। এই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। সমসাময়িক সময়ে ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে রতনমণির নেতৃত্বে বিষাং কৃষক বিদ্রোহ চলছে। এই অবস্থায় শ্রমিকদের উপর নেমে এল চরম অত্যাচার। তাদের অনেককেই রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজ্য সরকার তখনকার মত সেই আন্দোলনকে দমন করলেন, প্রকারান্তরে চরম অত্যাচারের মুখে পড়ে শ্রমিকরা তাদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন।

এইখানে এই আন্দোলনের ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রয়াত ত্রিপুর চন্দ্র সেনের নিজস্ব অভিমত না দিলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ৺ত্রিপুর সেন তাঁর "Tripnra in Transation" বই এর ৩৭ পৃঃ বলেছেন—"At about 1941 AD. Monopholy was granted to one M/S N M. T.S for traffie between Akhaura Rly Station and Agartala town and as a re sult the pirvate Owned Motor industries at Agartala Come at a stake. The Tripura Motor Workes Association Lunched a Campain against the then Government of Tripura. Unfortunately Sarat chaudra Bose, a Barrister of calcutta who was belived to be the friend

and helper of the Orgainisation Sent some correspondenco of the Association to the Tripura state Authority and hence there was a repression and the members hed to suffer serious loss and the said Organisation come to an end."

প্রয়াত ত্রিপুর সেন এই আন্দোলনের ব্যর্থতার মূলে সংগঠন দরদী কলিকাতার ব্যারিষ্টার শরৎচন্দ্র বসুর নাম উল্লেখ করেছেন। এই "শরৎ" ই কি সেই "শরৎ" যিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের ভ্রাতা এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধা (?) নাকি ঐ "শরৎ", যিনি একাদিকে আইনজ্ঞ এবং ত্রিপুরার রাজ দরবারের একসময়ে দেওয়ান ছিলেন, এবং যাকে নিয়ে মহারাজ কুমার মহেন্দ্র দেববর্ম্মার অধুনালুপ্ত "ধুমকেতু" পত্রিকায় এক শ্লেষাত্মক কবিতা বেরিয়েছিল—

"এক ঠগ দুই ঠগ—তিন ঠগের মেলা।
ঠগের গুরু দুর্গা প্রসাদ কৃষ্ণ প্রসাদ তার চেলা।
হয় কথা না হয় কথা-শরৎ বোস পারে
কুম্ভ কারের চক্র যেন উমাকান্ত ঘোরে"—

এভাবেই চরম নিষ্পেষণের মধ্যে মোটর শ্রমিকদের আন্দোলন ব্যর্থ হল। কিন্তু এই সংগ্রামী শ্রমিকরা তাদের আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রেখে গেল সংগ্রামের প্রেরনা এবং শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি ও কৌশল অন্য দিকে সেদিনের সেই চা-শ্রমিক, চিনবাগান শ্রমিক, এবং মোটর শ্রমিকদের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে ত্রিপুরার সামন্ত প্রভুরা নির্যাতনের সমস্ত রকম কলা কৌশল গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু নির্যাতনই যে শেষ কথা নয়—সামনে আছে জাগরণ। তাই এই নির্যাতন সত্বেও সামন্ত প্রভুরা শ্রমিকদের প্রথম জাগৃতির উন্মাদনাকে আটকাতে পারেনি। সেদিনের সেই নির্যাতিত শ্রমিকরাই ছিল আজকের শ্রেণী সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রদূত।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)